

অহ. জ্ঞানানন্দ চাহিয়া দেখিলেন—দিব্যমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় শিব ও পার্ব্বতী দণ্ডায়মান।—২য় পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীভোলানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি প্রণীত

প্রকাশক—

স্বামী কেদারানন্দ গিরি

ভোলানন্দ-সন্ন্যাসাশ্রম

লালতারাবাগ

হরিদ্বার।

। ১৩১৮ ।

মূল্য বারো আনা মাত্র

প্রকাশক—
স্বামী কেদারানন্দ গিরি
ভোলানন্দ-সন্ন্যাসাশ্রম
লালতারাবাগ
হরিদ্বার।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমৎ স্বামী কেদারানন্দ গিরি, ভোলানন্দ-সন্ন্যাসাশ্রম,
লালতারাবাগ, হরিদ্বার।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার গুহ, পি, ডবলিউ, আই, ই, আই, রেলওয়ে
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।

শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মিত্র, মরগ্যান কোং ১ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

প্রিণ্টার
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড,
বেনারস ব্র্যাঞ্চ

উৎসর্গ-পত্র

যিনি দ্বাদশাধিক বৎসর কঠোর গুরুসেবায় অতিবাহিত করিয়াছেন

সেই ত্যাগের প্রতীক্

গুরুগতপ্রাণ

সোদর-প্রতিম

শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রথম সন্ন্যাসী-শিষ্য

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি

মহারাজের করকমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ

অর্পিত হইল।

বিনীত

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি

ভূমিকা

শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের জীবনী লিখিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে জীবনী সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—'জীবনী দিয়ে কি হবে, শরীরটা ত একটা রক্ত-মাংসের খাঁচা, এর আবার জীবনী কি রে।' সুতরাং তাঁহার জীবনী লিখিবার ইচ্ছা পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। এই সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল তাঁহার মধুর সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া নানা কথাচ্ছলে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে দু-একটা কথা যাহা শুনিয়াছি এবং তাঁহার নিকট পত্রাদি পড়িবার ও তাহার উত্তর দিবার ভার সাধারণতঃ আমার উপরই ন্যস্ত থাকায় সেই সুযোগে যাহা অবগত হইয়াছি এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার কোন কোন শিক্ষিত ও বিশ্বস্ত ভক্ত হইতে যাহা জ্ঞাত হইয়াছি, সেই সমস্তই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইল। এই গ্রন্থ শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের নিকট আদৃত হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ হরিদ্বার ভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রমে ব্যয়িত হইবে। অলম্ বিস্তারেণ

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি

মঙ্গলাচরণম্

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুগুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীভোলানন্দ-প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

[১]

সংসার-ত্যাগী ভোলানন্দ

সে অনেক দিনের কথা। পাঞ্জাবের এক প্রান্তে কোন বৃদ্ধার হৃদয়ে বিরহ-বেদনা প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল, নয়নাশ্রুতে বক্ষ প্লাবিত হইয়া গেল; "হা পুত্র, হা পুত্র" করিয়া বৃদ্ধা ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইল। গ্রামের কতিপয় বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া আসিয়া বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছে। কিন্তু সান্ত্বনা-বাক্য বৃদ্ধার বিরহ-দগ্ধ হৃদয়ে কণামাত্র শান্তি প্রদান করিতে পারিল না; বৃদ্ধার শোক অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হায় বিধাতঃ! তোমার এ কি অপূর্ব্ব লীলা? মানব-বুদ্ধির অগম্য তোমার লীলাকে অজ্ঞ মানব বুঝিতে প্রয়াস পাইয়া বিফলমনোরথ হইতেছে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মঙ্গলময় পরমেশ্বর যাহা কিছু করেন, জীবের—আমাদের—মঙ্গলের জন্যই—এ ভাবটি যদি

জীব-হৃদয়ে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া যাইত, তাহা হইলে এই যে দিন দিন শত সহস্র জীব ভগবানের বিধানকে দোষতুষ্ট এবং অমঙ্গল বলিয়া দুঃখ-দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে হা-হুতাশ করিতেছে ও করুণাময় পরমেশ্বরের অশেষ নিন্দা করিতেছে—ইহা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া জীবের হৃদয় শান্তির বিমল কিরণে উদ্ভাসিত হইত। কিন্তু তাহা হইবার নয়। জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন, তাই রজ্জুতে সর্প আরোপিত করিয়া ভয়ে ম্রিয়মাণ হইতেছে; বহুরূপী ভগবানের লীলাকে বুঝিতে না পারিয়া,—নিজের সত্ত্বাকে জানিতে না পারিয়া, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি অজ্ঞান-কল্পিত কতকগুলি জিনিষের ভয়ে ভীত ও চকিত হইয়া কালযাপন করিতেছে। রজ্জু সর্প নয়—রজ্জুই; এ ভাবটি যদি অজ্ঞ পথিকের ধারণা হইয়া যাইত, তাহা হইলে বৃথা ভয় ও দুঃখে কম্পিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া কাষ্ঠবৎ পথের উপর দাঁড়াইয়া থাকিত না; সানন্দমনে গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইত। জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি জীবাত্মার নয়—পরন্তু স্থূল শরীরের—এটি যদি জীব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিত, তবে জগৎকে এক নবভাবে দেখিতে সক্ষম হইত—মনে হইত, ভগবানই সকল মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই বহুরূপী হইয়া লীলা করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার মধ্যে দুঃখ কোথায়? সাধন-বলে কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি যখন এ ভাবটি লাভ

করিতে সক্ষম হন, তখন তিনি সকল দুঃখ ও সন্তাপের হাত হইতে মুক্ত হইয়া যান; জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হইয়া এই শরীর বর্ত্তমানেই মোক্ষানন্দ লাভে সমর্থ হন। ভগবান্ করুন, আমরাও যেন তাঁহারই কৃপায় ও নিজেদের সাধন-বলে সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে সক্ষম হই; মায়ার কুহকে যেন আর মুগ্ধ না হই।

মায়ামুগ্ধা বৃদ্ধার শোক-সন্তপ্ত মন যখন কোন প্রকারেই শান্তিবারি পান করিতে সক্ষম হইল না, তখন অগত্যা শোকের প্রাবল্যে ক্ষণিকের জন্য জাগতিক বস্তুসকল ভুলিয়া একমাত্র পুত্রের স্মৃতি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সে হা-হুতাশ ভাব আর পরিলক্ষিত হইল না। চঞ্চল জগৎ যেমন রাত্রি আগমনে গম্ভীর ও নিস্তব্ধভাব ধারণ করে, তদ্রূপ বৃদ্ধাও কিছুক্ষণ হা-হুতাশ করিয়া পরিশেষে শ্রান্তা ও ক্লান্তা হইয়া শুইয়া পড়িল।

মাতাকে ও ভ্রাতৃবৃন্দকে শোক-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ভোলানাথ হঠাৎ আজ সংসারের ভোগ-বাসনা সমূলে বর্জ্জন পূর্ব্বক একমাত্র জগতের সার, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, জগতের আশ্রয় ও আনন্দ-মূর্ত্তি ভগবানের অন্বেষণে সর্ব্বত্যাগী হইল। ক্ষণিকের জন্যও স্নেহময়ী মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের চিন্তা আসিয়া তাহার ধর্ম্মের পথে, ত্যাগের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতে পারিল না।

"কবে ভবের সুখ-দুঃখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব শ্রীহরি স্মরিয়া ;
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারও আকুল ক্রন্দনে।"

বিবেক-বৈরাগ্যের তীব্র দংশনে যখন জীব অভিভূত হয়, যখন জগতের অনিত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে, যখন পিতা, মাতা প্রভৃতি মায়িক, ইহাদের সহিত বস্তুতঃ কোন সম্পর্ক নাই—পথিকের সহিত যে প্রকার পথিকের আলাপ হয়, তদ্রূপ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সকলেই এই জগৎরূপ পান্থশালায় দু' দিনের জন্য আসিয়া একত্রে সম্মিলিত হইয়াছে, সময় ফুরাইয়া গেলে সকলেই স্ব স্ব গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইবে—এই প্রকার ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয়, তখন জগতে এমন কোন শক্তি থাকে না, যাহা জীবকে সাধনমার্গ বা ত্যাগের পন্থা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে।

ভোলানাথও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে এইরূপ বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করিয়া হঠাৎ আজ পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হইবার প্রবল ইচ্ছায় জগতের মায়িক সম্বন্ধে আবদ্ধ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গকে পরিত্যাগ করিতে ক্ষণিকের জন্যও ইতস্ততঃ না করিয়া একমনে পথ চলিতে লাগিল। কোথায় গেলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়—কোথায় গেলে দুর্লভ মানবজন্ম সফল হয়—কোথায় গেলে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও

আধিভৌতিক তাপত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে পারা যায়,—কোথায় গেলে জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ব দুঃখের নিবৃত্তি করা যায়—কোথায় গেলে স্থূল-শরীর প্রভৃতি হইতে ভিন্ন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মার উপলব্ধি হয়—এই চিন্তায় মগ্ন ভোলানাথ দ্রুত-পদবিক্ষেপে ক্রোশের পর ক্রোশ চলিতে লাগিল।

[২]

লব্ধগুরু ভোলানন্দ

রাত্রি প্রভাত হইল। বিহগের কূজনে দিগ্‌দিগন্তর মুখরিত হইতে লাগিল। কাকের কা কা, কোকিলের কুহু কুহু ধ্বনি মোহনিদ্রায় শায়িত মানববৃন্দকে দিবা-আগমনের সূচনা জ্ঞাপন করাইতে লাগিল। জনসাধারণ স্ব স্ব শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে রত হইল। ছাত্র অধ্যয়নে রত হইল, কর্ম্মী কর্ম্মে ব্যাপৃত হইল; ভিক্ষু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার জন্য 'রাধে কৃষ্ণ' বলিয়া বহির্গত হইল। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ-জগৎও চঞ্চল হইয়া উঠিল। যোগীর কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই; তিনি অনিমেষ-নয়নে হৃদয়াকাশে ভগবানের রূপ দেখিতে

লাগিলেন; আপন-ভোলা, জগৎ-ভোলা হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মগ্ন রহিলেন। কোথায় জগৎ, কোথায় জীব—সকলই যে চিন্ময়। সিদ্ধ যোগী সমাধিতে স্থিত। সাতটা বাজিল, আটটা বাজিল, নয়টা বাজিল, দশটা বাজিল—তথাপি যোগীর সমাধিভঙ্গের কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইল না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যোগীর মনে বাহ্যজগতের স্মৃতির স্ফুরণ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যোগীর মন আধ্যাত্মিক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া জগতে বিচরণ করিতে লাগিল। 'প্রভুর সমাধি ভঙ্গ হয়েছে, জল্‌দি চলে এস, তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মনুষ্য-জন্ম সফল করি' বলিয়া একজন সাধু অপর চার-পাঁচ জন সাধুর সহিত যোগীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। স্নেহের আধার, করুণার মূর্ত্তি যোগী তাহাদের মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক স্নেহের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিষ্যবৃন্দও ভক্তি-বিনম্র-হৃদয়ে তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষতা লাভ করিবার মানসে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তরলাভ পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। এমন সময় একটি উদাস-চিত্ত বিংশতিবর্ষীয় যুবক আসিয়া যোগীর নিকট উপনীত হইল। সূর্য্যসমকান্তি যোগীকে দর্শন করিয়া যুবকের মন এক স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইল। ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া সে যোগীর সহিত নিজেকে অভেদরূপে দেখিতে পাইল;

পরক্ষণেই আবার তাহার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া আসিল। সে যোগীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ভক্তিবিনম্রচিত্তে সানন্দ মনে যোগীর নিকট উপবিষ্ট হইল।

কুরুক্ষেত্রের নিকটে, জিলা কর্ণাল, ডাকখানা কওয়ালের অন্তর্গত পস্থানা নামে একটি আশ্রম আছে। উক্ত আশ্রমে অনেক সাধু মহাপুরুষ বাস করিয়া থাকেন। শ্রীমৎ স্বামী গোলাপগিরিজী মহারাজ একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ, উক্ত আশ্রমেরই সাধু। আমাদের পূর্ব্বোক্ত যোগী মহারাজই এই স্বামীজী।

ভোলানাথ সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গুরু অন্বেষণে নানাস্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায়ও মনোমত গুরু লাভ করিতে না পারিয়া হতাশ-ভাবে কালযাপন করিতেছিল। এমন সময় কোন সাধুর মুখে বাবা গোলাপগিরিজীর অলৌকিক শক্তির কথা শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে তাঁহার নিবাসস্থল পস্থানাশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রতি ভ্রূক্ষেপশূন্য হইয়া সে পস্থানা আশ্রমে যোগীর নিকটে উপনীত হইয়া যাহা করিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন। স্বর্ণকার যে প্রকার উত্তম স্বর্ণ পাইলেই আনন্দে আত্মহারা হয় এবং তাহা দ্বারা উত্তম উত্তম অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া সকলের হৃদয় মুগ্ধ করে; সূত্রধর যে প্রকার উত্তম কাষ্ঠ পাইলেই আনন্দে উৎফুল্ল

হয় ও তাহা দ্বারা উত্তম উত্তম জিনিষ প্রস্তুত করিয়া লোকের মনে অশেষ আনন্দ উৎপাদন করে ; তদ্রূপ সদ্‌গুরু, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও উত্তম শিষ্য পাইলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া শিষ্যের প্রতি সমধিক স্নেহশীল হন এবং ধীরে ধীরে শিষ্যকে ব্রহ্মবিৎ করিয়া শিষ্যের এবং জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এ প্রকার শিষ্যের সংখ্যা নিতান্তই বিরল ; তাই সদ্‌গুরু লাভ করিয়াও মুগ্ধ মানব আধ্যাত্মিক জীবনে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে না। বিবেক-বৈরাগ্য না থাকিলে মাত্র গুরুকৃপা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হওয়া অসম্ভব, তাই একই গুরুর শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞানী, অর্দ্ধজ্ঞানী, অল্পজ্ঞানী, মূর্খ প্রভৃতি বহুপ্রকারের শিষ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। লব্ধবৈরাগ্য ভোলানাথকে দেখিবামাত্রই বাবা গোলাপগিরিজীর মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন, ভোলানাথের হৃদয় ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্বরূপ, ভোলানাথের হৃদয়ে জ্ঞানালোক বর্ত্তমান—সামান্য একটু আবরণ থাকায় তাহা প্রকাশ পাইতেছে না ; গুরুরূপী তিনিই এই আবরণ দূর করিতে সক্ষম হইবেন—ভোলানাথকে ব্রহ্মজ্ঞ দেখিয়া নিজকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিবেন। অন্তর্দ্দর্শী মহাপুরুষ এই প্রকারে নিজের প্রধান শিষ্যকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। ভোলানাথও নিজের স্বভাবোচিত নম্র ও মধুর ব্যবহারে সমাগত সাধুবৃন্দ ও গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। কালবিলম্ব না

করিয়া ভোলানাথ নিজের স্থূলদেহের প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি না দিয়া কায়মনোবাক্যে গুরুসেবায় রত হইল। গুরুদেবও ভোলানাথকে পরীক্ষা করিবার মানসে তাহাকে আশ্রমের কঠোরতর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। বৈরাগ্যবান্ সাধক গুরুভক্ত ভোলানাথ গুরুদেবকেই শিবভাবে দর্শন করিত, সুতরাং তাঁহার দ্বারা যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইত, অম্লানবদনে তাহা সম্পাদন করিত। গুরুদেবের আদেশানু-যায়ী রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইত। প্রাতঃকালে আসন হইতে উঠিয়া আশ্রমস্থ শিবের পূজা শেষ করিয়া সমাগত সাধুবৃন্দ ও পরমারাধ্য গুরুমহারাজের জন্য রুটি, ডাল প্রভৃতি স্বহস্তে প্রস্তুত করিত। এতদ্ব্যতীত প্রায় এক মণ গোদুগ্ধকে আলোড়িত করিয়া প্রত্যহ মাঠা প্রস্তুত করিত। গুরুমহারাজ ও সাধুগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে এবং গুরুমহারাজ শয্যা গ্রহণ করিলে ভোলানাথ অন্ন গ্রহণ করিত। মধ্যাহ্ন সময় বৃথা নিদ্রায় অতিবাহিত না করিয়া সে শাস্ত্রাধ্যয়নে রত থাকিত; তারপর যথাবিহিত আশ্রমের অন্যান্য কর্ত্তব্য শেষ করিয়া সায়ংকাল শিবপূজা ও আরতিতে অতিবাহিত করিত। ভোলানাথ এই প্রকারে পাঞ্চভৌতিক শরীরের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া গুরুর তুষ্টি সম্পাদন মানসে অত্যধিক কায়িক পরিশ্রম করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইত না এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক শাস্ত্রের গূঢ়ভাব উপলব্ধি

করিবার জন্য রাত্রে কঠোর সাধনে ব্যাপৃত থাকিত। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

অর্থাৎ—আপনি আপনার উদ্ধার করিবে, আপনাকে অবসন্ন করিবে না; আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু।

ভোলানাথও যেন উক্ত শ্লোকের গূঢ়ার্থ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াই—নিজের পুরুষকারের দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যা বা মুক্তিলভ্যা যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনে রত থাকিত। বস্তুতঃ দৈব বলিয়া কোন জিনিষই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুরুষকারই সকল ভূতের আশ্রয়িতব্য। পূর্ব্বের পুরুষকারই এখন দৈব বলিয়া অভিহিত হইতেছে। যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ভগবান রামচন্দ্রকে এই প্রকারই উপদেশ দিয়াছেন। নিজের চেষ্টাদ্বারা এই জন্মেই উন্নতির উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করা যায়, আবার অলস-ভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া দৈবের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে অনেক সময়েই 'যেই তিমিরে সেই তিমিরে' থাকিতে হয়। ভোলানাথও ইহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া পুরুষকারের শরণাপন্ন হইল—অসীম উৎসাহে গুরু-সেবায় ও সাধন-ভজনে রত হইল।

[৩]

গুরু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভোলানন্দ

'দেখ্‌ত ভোলা বাহিরে আছে কিনা'—বলিতেই জনৈক শিষ্য তাড়াতাড়ি আশ্রমের বাহিরে যাইয়া দেখিল—কৌপীন মাত্র পরিহিত ভোলানাথ শীতের প্রাবল্যে হুঁ হুঁ করিয়া কাঁপিতেছে।

পৌষমাস; শীতের প্রাবল্যে জীব-শরীর সঙ্কুচিত। এমন সময় হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বাবা গোলাপগিরিজী মহারাজ কঠোরভাবে ভোলানাথকে বলিলেন—'ভোলা! সব বস্ত্র রেখে শুধু কৌপীন পরিধান করে আশ্রম হতে দূর হয়ে যা, তোর মত শিষ্যের আমার কোন প্রয়োজন নাই।' গুরুমহারাজ আমার উপর কেন রুষ্ট হইলেন—কারণ অনুসন্ধান করিতে অক্ষম গুরুগতপ্রাণ ভোলানাথ গুরুর বাক্য-রক্ষার্থ শুধু কৌপীন পরিধান করিয়াই আশ্রম হইতে বহির্গত হইল। শীতের প্রকোপে অত্যধিক কষ্ট পাইতে লাগিল; তথাপি কোন লোকের কাছে বস্ত্রের জন্য না গিয়া কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া আশ্রমের বহির্ভাগে শীতে হুঁ হুঁ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রাত্রি যাপন করিল। গুরুই শিব, তিনি আমার কোন অন্যায় দেখিয়াই এবম্প্রকার শাস্তির বিধান করিয়াছেন—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভোলানাথ নিজের উপর অত্যধিক বীতশ্রদ্ধ হইল। এই শরীরটাই

যত অনর্থের মূল, হয় ত এই শরীরকেই আরাম দিবার জন্য এমন কোন অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে গুরুমহারাজ আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ; গুরু সাক্ষাৎ শিব—তিনি রুষ্ট হইলে এ শরীর থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল,—এই প্রকার চিন্তায় চিন্তিত ভোলানাথ শরীরের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাত্রি যাপন করিতেছিল।

প্রভাত হইল ; করুণার আধার গোলাপগিরিজী জনৈক শিষ্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক ভোলানাথের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন।

ভোলানাথ গুরুসেবায় অধিকতর যত্নবান দেখিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে বাবা গোলাপগিরিজী বিনা কারণে কখনও কখনও তাহাকে কর্কশ বচন বলিতেন। প্রথমতঃ, ভোলানাথের হৃদয়ে উক্ত বাক্যে দুঃখের সঞ্চার হইত ; কিন্তু সে গুরুকে কিছু না বলিয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইত। পরিশেষে শব্দ আকাশের গুণ,—আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই গুরুমহারাজ এবম্প্রকার কর্কশ-বাণী ব্যবহার করিয়া থাকেন, বুঝিতে পারিয়া ভোলানাথ গুরুমহারাজের কঠোর বাণীতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত না হইয়া সহাস্যবদনে সেবাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। গুরুমহারাজ যখন দেখিলেন, কর্কশ-বাণী ভোলানাথের মনে কোন প্রকার ক্ষুব্ধতা উৎপাদন করিতে পারে না, তখন তিনিও ভোলানাথের প্রতি কঠোর বাক্য ব্যবহার করিতে বিরত হইলেন।

হঠাৎ একদিন তাহাকে অধিকতর কঠোরভাবে পরীক্ষা করিবার মানসে গোলাপগিরিজী মহারাজ তাহার সহিত উক্ত প্রকার ব্যবহার করিলেন। সাধারণ শিষ্য হইলে গুরুর এবম্প্রকার ব্যবহারে দুঃখিত ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্থানান্তরে গমন করতঃ শীত নিবারণ করিত ও ভবিষ্যৎ দুঃখ পরিহার করিবার জন্য গুরুর নিকট হইতে চিরতরে দূরে অবস্থান করিত। কিন্তু গুরুগতপ্রাণ সাধকের ভাব আমাদের ভোলানাথের ভাবের ন্যায়ই হইবে। গুরুই শিব—ইহা যিনি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, গুরু সর্ব্বদা প্রহার করিলেও তিনি গুরুকে ত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র থাকিতে পারেন না—আমাদের ভোলানাথই সে বিষয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শিষ্য আসিয়া বলিল—ভোলানাথ বাহিরেই দণ্ডায়মান আছে। গোলাপগিরিজী ইহা অবগত হইবামাত্র দ্রুতপদ-বিক্ষেপে ভোলানাথের নিকট উপস্থিত হইয়া কঠোরবাক্যে বলিলেন—'যা, কাপড় পরে শিবপূজা কর গে'। পাঠক! আপনাদের মনে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল, গোলাপগিরিজী কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভোলানাথের সঙ্গে নিশ্চিতই মধুর ব্যবহার করিবেন, কিন্তু আপনাদের ধারণার বিরুদ্ধ কার্য্য হইলেও গোলাপগিরিজী ভোলানাথকে পুনরায় কঠোরভাবে আদেশ করিলেও আপনারা বিস্মিত হইবেন না; কারণ মহাপুরুষগণ কখন্ কি কারণে কি প্রকার ব্যবহার করেন, তাহা মানববুদ্ধির অগম্য। মহাপুরুষগণের

হৃদয়ে প্রেমসমুদ্র প্রবাহিত, শুধু দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন বা ভক্তকে পরীক্ষা করিবার জন্য কঠোর ভাব ব্যক্ত করেন; বস্তুতঃ, তাঁহাদের মধ্যে কঠোরতার লেশমাত্রও নাই, তাঁহারা স্বভাবতঃই দয়ালু ও পরোপকার-রত।

গুরু কাপড় পরিধান করিয়া শিবপূজা করিতে বলিলেন শুনিয়া ভোলানাথ আনন্দে উৎফুল্ল হইল। গুরু আমাকে আবার তাঁহার চরণে স্থান দিয়াছেন, আমার দোষ ক্ষমা করিয়া আমার হিতচিন্তা করিতেছেন—এই ভাবিয়াই ভোলানাথ আনন্দে আত্মহারা হইয়া অধিকতর নিষ্ঠার সহিত শিবপূজা এবং আশ্রমের অন্যান্য সেবাদি করিতে লাগিল।

ভোলানাথের এবম্প্রকার গুরুভক্তি দেখিয়া গোলাপ-গিরিজী তাহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভবিষ্যতে আর কোনদিন তাহাকে পরীক্ষা করিতে প্রয়াস পান নাই। গুরু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভোলানাথও গুরু-কৃপায় ও সাধনবলে দিন দিন আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতর শৃঙ্গে ধীরে ধীরে উন্নীত হইতে লাগিল। গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাসলাভ পূর্ব্বক ভোলানাথ—স্বামী ভোলানন্দ গিরি নামে খ্যাত হইল। তাহার গুরুভক্তি ও সেবায় এবং শাস্ত্রানুরাগে জনসাধারণ অহর্নিশি তাহার স্তুতি করিতে লাগিল।

[৪]

মাতৃ-সমীপে ভোলানন্দ

'আপনি সন্ন্যাসী হয়ে আমাকে প্রণাম করলেন কেন, আমায় পাপ স্পর্শ করেছে'-- বলিয়াই সন্ত্রস্তভাবে বৃদ্ধা একটু দূরে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসীটি বলিল— 'আপনার উপর আমার মাতৃভাব হয়েছে, মাতৃবুদ্ধিতে প্রণাম করেছি, এতে আপনার পাপ হয় নাই।'

পাঞ্জাব প্রদেশ সাধারণতঃ সাধুভক্ত। গুরু নানকের উপদেশানুযায়ী পাঞ্জাবী জনসাধারণ সাধুকেই সাক্ষাৎ নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করে। একদিন একজন সন্ন্যাসী পাঞ্জাবে বহু গ্রাম পর্য্যটন পূর্ব্বক একটি গ্রামে উপনীত হইয়া বিভিন্ন ঘর হইতে রুটি ভিক্ষা করিতে লাগিল। গ্রামবাসীরাও সাধুর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাহাকে যথাসাধ্য দ্রব্যাদি অর্পণ করিল। সাধু হঠাৎ একটি গৃহে উপস্থিত হইয়া 'নারায়ণ হরি' বলিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। গৃহাভ্যন্তরে জপনিরতা বৃদ্ধার কর্ণে সে শব্দ প্রবেশ করিল। সাক্ষাৎ নারায়ণ দ্বারে দণ্ডায়মান—ভীত ও ভক্তিভাবে বৃদ্ধা জপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বহস্তে রুটি গ্রহণ পূর্ব্বক সাধুকে অর্পণ করিলেন। সাধু রুটি গ্রহণ পূর্ব্বক হঠাৎ বৃদ্ধার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল; প্রণামান্তেই সাধু তড়িদ্বেগে ছুটিতে লাগিল। বৃদ্ধা সাধুর ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া অনিমেষ-নয়নে সাধুর প্রতি

তাকাইয়া রহিলেন। সেই অতীতের স্মৃতি আসিয়া বৃদ্ধার উদ্বেলিত হৃদয়কে অধিকতর উদ্বেলিত করিতে লাগিল। এগারো বারো বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়াকাশে পুনরায় নবীভূত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা হারাধন ভোলানাথকে লাভ করিয়াও ধরিতে বা চিনিতে পারিলেন না। ভোলানাথও পরিচিত হইবার ভয়ে দ্রুতপদবিক্ষেপে গ্রাম পরিত্যাগ করিল। ভোলানাথ দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে বৃদ্ধা ভোলানাথের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া শোকাকুল হইলেন, নয়নাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল, বিরহ-বেদনা পুনরায় নবীভূত হইয়া উঠিল; এতদিনের ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি আজ পুনরায় ভস্ম ভেদ করিয়া দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। বিরহব্যাকুলা, পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধার আজ আর শান্তি নাই, জপে আর মন বসিল না। বিক্ষিপ্তহৃদয়া বৃদ্ধা শুইয়া শুইয়া ভোলানাথেরই চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সমাগত সাধুটিই আমার ভোলানাথ, ভোলানাথ এবং সন্ন্যাসীটির মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য বর্ত্তমান—তবে ভোলানাথ আমায় পরিচয় না দিয়ে হঠাৎ চলে গেল কেন, আমার ভোলানাথ এত নির্ম্মম হ'তে পারে না, এ নিশ্চয়ই অন্য কোন সাধু— ইত্যাদি নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা আসিয়া বৃদ্ধার হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। বৃদ্ধা শোকের প্রাবল্যে কিছুক্ষণ মুহ্যমান থাকিয়া পুনরায় দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। শোকের মাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে লাগিল। মাতৃহৃদয়ে

এতটুকু প্রেম যদি ভগবান না দিতেন, তবে জীবের অস্তিত্বই থাকিত না, প্রসব হইবার পরক্ষণেই জীবকে ইহ-সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত; সেবার অভাবে জীব হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। তাই ভগবান কৃপাপূর্ব্বক অফুরন্ত স্নেহ, অহৈতুকী ভালবাসা দিয়া মাতৃ-হৃদয় প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রেমের পুত্তলী স্ত্রী ধন ও স্পর্শ-সুখের লালসায় স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হয়। নির্ধন স্বামীকে অনেক সময়েই প্রেয়সীর গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। এমন সতী-সাধ্বী লক্ষ্মী-স্ত্রী জগতে অত্যন্ত বিরল—নিঃস্বার্থ হইয়া যে পতিকে ভালবাসে। অথচ মুগ্ধ জগৎ সেই স্ত্রীর প্রতিই সকলের চেয়ে অধিক অনুরক্ত হয়। মা—যিনি পুত্রের শতদোষ বর্ত্তমান সত্ত্বেও—পুত্র নির্ধন হইলেও—মাতার প্রতি সর্ব্বদা কটূক্তি প্রয়োগ করিলেও—ধনী অবস্থায় মাতার সেবা হইতে পরাঙ্মুখ হইলেও পুত্রকে অহৈতুকভাবে স্নেহ করেন ও পুত্রের সামান্য কষ্ট হইলেই যিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন, যিনি না খাইয়া পুত্রকে খাওয়ান—সেই মাকে অবহেলা করিয়া কত পাপিষ্ঠ নরাধম জগতের সম্মুখে নিজেদের কলঙ্কলিপ্ত চরিত্র প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। মূর্খ, বিদ্বান্, ধনী, দরিদ্র, কুলীন, অকুলীন, যুবা, প্রৌঢ় সকলেই যেন এক ছাঁচে প্রস্তুত। মাতৃভক্তি যেন জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া কোন নিভৃত পর্ব্বত-গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়াছে। তাই মাতৃবিদ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণের হৃদয়-রাজ্যে

অশান্তির রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৃহে গৃহে দুঃখ ও অশান্তি বিদ্যমান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবজ্ঞা-পূর্ব্বক নিজেকেই সকলের চেয়ে বড় ও প্রতিষ্ঠিত মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া অশান্তিময় জীবন অতিবাহিত করিতেছে। সে লক্ষ্মণ আর নাই—যিনি রামের সঙ্গে বনে বনে ঘুরিয়া স্বেচ্ছায় শত দুঃখ মাথায় ধারণ করিয়াছিলেন। প্রেমময়ী যুবতী-স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার দুঃখে দুঃখী হইয়া দিনরাত পিতৃতুল্য জ্ঞানে ভ্রাতার সেবায় রত থাকা, এখন যেন বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া মনে হয়।

যখন প্রতিগৃহে পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সৌজন্য বর্ত্তমান থাকিবে, তখনই জগতে শান্তি বিরাজ করিবে; গৃহে থাকিয়াও মানবগণ এক স্বর্গীয় অপার্থিব আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। ভগবান করুন, আমাদের হৃদয়ে যেন ভক্তি ও প্রেমের অমৃতধারা চিরতরে প্রবাহিতা হয়—যেন কুটিলতা, দ্বেষ, হিংসা,পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি আসুরিক সম্পদ্ চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমাদের মনকে শম, দম, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি দৈবসম্পদে বিভূষিত করে।

ভোলানাথ সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুর নিকটেই অবস্থান করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এগারো বৎসর গত হইল একদিন বাবা গোলাপগিরিজী ভোলানাথকে বলিলেন–

"ভোলা! তুই প্রায় বারো বৎসর হ'তে চল্‌ল সংসার ত্যাগ করেছিস্, একবার জন্মভূমি দর্শন এবং মাতাকে প্রণাম করে চলে আয়—দেখিস্, মাকে যেন আত্মপরিচয় না দিস্।" গুরুর আদেশানুযায়ী ভোলানাথ কালবিলম্ব না করিয়া নিজের গ্রামে উপনীত হইয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া গুরুর সমীপে উপস্থিত হইল।

দ্বাদশ বৎসরান্তে বাবা গোলাপগিরিজী ভোলানাথকে বলিলেন—"ভোলা! তুই আমার অনেক সেবা করেছিস্ এবং তোর ব্যবহারে ও ভক্তিতে আমি বস্তুতঃই অতীব সন্তুষ্ট হয়েছি, তুই এখন অন্যত্র যেয়ে কঠোর সাধনে ব্যাপৃত হ; আমি তোকে বর দিচ্ছি—তোর যোগ ও ভোগ উভয়ই লাভ হবে।"

গুরুর নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতে হইবে ভাবিয়া ভোলানাথ দুঃখে আত্মহারা হইল। অগত্যা গুরুর আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে, গুরু মঙ্গলময়—যাহা কিছু করেন বা বলেন, আমাদের মঙ্গলের জন্যই—এই ভাবিয়া ভোলানাথ গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কঠোর সাধনার উদ্দেশ্যে স্থানান্তরে গমন করিল। হিমালয় পর্ব্বত প্রাচীন, ঋষি-মুনি-সেবিত, তপস্যার অনুকূল মনে করিয়া ভোলানাথ বিশ্বনাথ গিরি আদি অপর চার পাঁচ জন সাধুর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিল।

[৫]

অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভোলানন্দ

"গিন্নি! দেখ ত অদূরে কে যেন দণ্ডায়মান রয়েছে, বোধ হয় কোন মহাত্মা হবে, শরীরের আকৃতিতে তাই মনে হচ্ছে; কিন্তু এমন সুন্দর পুরুষ আমি ত খুব কমই দেখেছি।" গিন্নি একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, সম্মুখে দিব্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসিবেশে একটি যুবক দণ্ডায়মান। সে শেঠজীর (জমিদার) কাছে আসিয়া বলিল—"প্রাণনাথ! উনি একজন সন্ন্যাসী, কিন্তু এমন সুন্দর কান্তিময় শরীর আমার দৃষ্টিপথে কখনও পতিত হয় নাই। সাধুটির বয়সও অল্প, আসুন একটি কাজ করা যাক্—আমাদের কন্যাটি এইমাত্র ১৫ বৎসরে পদার্পণ করেছে, তাকে এবং আমাদের সঞ্চিত এই চৌদ্দ লক্ষ টাকা এই সাধুটিকে দান করে আমরা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করি, এখন বৃদ্ধ হয়েছি, যাতে পরকালের একটু কাজ করতে পারি তার জন্যে সচেষ্ট হই; আর এই বিষয়মোহে আবদ্ধ থেকে কি লাভ?" শেঠজী বলিল—"গিন্নি! তা ঠিক বলেছ, কিন্তু ইনি যে সন্ন্যাসী, স্ত্রী গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না।" গিন্নি সহাস্যবদনে বলিল—"আরে রেখে দাও তোমার সন্ন্যাসী; যুবক ছেলে—চৌদ্দ লক্ষ টাকা পাচ্ছে, তার উপর এমন সুন্দরী যুবতী-স্ত্রী—ইহা কখনই পরিত্যাগ করতে পারবে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু

পর্য্যন্ত যে মোহে আবদ্ধ হয়ে দিনরাত হাবুডুবু খাচ্ছে, এই ক্ষুদ্র মানব কি করে সে প্রলোভন এড়াতে পার্‌বে। আর যদি একান্তই অস্বীকৃত হয়, তবে আমি অনেক অনুনয় করে এবং অধিকতর প্রলোভন দিয়ে একে বশ করিবই ; এ আমার দৃঢ়সংকল্প—এমন সুন্দর বর আমি কখনও ছাড়ব না।” শেঠজী বলিল—“তা দেখ, যদি পার ত আমাদের উভয়েরই সৌভাগ্য।” শেঠজীর বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই গিন্নি (শেঠজীর স্ত্রী) উক্ত সাধুটির নিকট উপস্থিত হইল।

কৌপীনমাত্র পরিহিত ভোলানন্দ * বিশ্বনাথ গিরি প্রভৃতি সাধুদের সহিত হিমালয়ের উচ্চতর শৃঙ্গে অবস্থান করিয়া কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। কঠোর তপোনিরত ভোলানন্দের মন এখন একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন। শরীর হইতে পৃথক্ নিজের চিন্ময় আত্মসত্তা জ্ঞাত হইয়া ভোলানন্দ নিজেকে কখনও ভগবানের দাস, কখনও বা ভগবান্ হইতে অভেদ ভাবে দেখিতে লাগিলেন। হৃদয়ে আনন্দ-সমুদ্র প্রবহমাণ হইল ; ভক্তি-মন্দাকিনীর অমৃতধারায় অবগাহন করিয়া মন ও প্রাণ পবিত্র হইল, হৃদয় হইতে কামাদি রিপু চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিল।

* পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভোলানাথ সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক ‘ভোলানন্দ’ নাম গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং এখন হইতে আমরা তাঁহাকে ভোলানন্দ নামে অভিহিত করিব।

জিতেন্দ্রিয় লব্ধজ্ঞান ভোলানন্দ দেখিতে পাইলেন,—সকলই চিন্ময়; দেবতা, মানব, পশু, পক্ষী সকলই পরমকারুণিক পরমেশ্বরের এক একটি সচল বিগ্রহ, তাই জীবই শিব! নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা কর—মুক্তি তোমার করতলগতা। হিমালয়ের তুষার মধ্যে কঠোর সাধনে নিরত থাকিয়া ভোলানন্দ সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। তার পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক ৺দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ দর্শন-মানসে বম্বে নগরীতে কোন এক ধনীর গৃহ-দ্বারে আসিয়া মাধুকরী করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ভোলানন্দকে দেখিলে মনে হয়, যেন তিনি কেবলমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। ভোলানন্দের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া গৃহস্বামী ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে যে প্রকার কথোপকথন হইল এবং স্ত্রী যাহা করিল পাঠক তাহা অবগত আছেন। শেঠের স্ত্রী পরম আদর-পূর্ব্বক ভোলানন্দকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেল। ভোলানন্দ সেখানে একটি কেদারায় উপবেশন করিলেন। শেঠজী ভোলানন্দের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং মনে মনে তাঁহাকেই নিজের জামাতার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্থির করিল। গিন্নিও ভোলানন্দের রূপে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে তাঁহাকে জামাতৃ-পদে বরণ করিল। শেঠ ও তাহার স্ত্রীর দুরভিসন্ধির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ভোলানন্দ মধুর ও নম্রভাবে বলিলেন—"আমার সময় নাই, মাধুকরী দিন্, চলে যাই।" তখন গিন্নি অগ্রসর হইয়া

ভোলানন্দকে বলিল—"দেখুন সন্ন্যাসীঠাকুর! আপনি এই অল্প বয়সে কেন শুধু শুধু কষ্ট কর্‌ছেন, বৃদ্ধ বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করবার নিয়ম; যুবকের জন্য ভোগ, বৃদ্ধের জন্য যোগ। তা আপনি দেখ্‌ছি এর উল্টা চল্‌ছেন। এমন সুন্দর শরীর, এত অল্প বয়স—আপনি একটি কাজ করুন, আমাদের চৌদ্দ লক্ষ টাকা মজুদ আছে, এই টাকা আপনি গ্রহণ করুন; অধিকন্তু দেখুন, আমাদের কোন পুত্রসন্তান নাই, শুধু একটি বিবাহ-যোগ্যা কন্যা আছে; আপনি তাহার পাণিগ্রহণ করুন।"

কি ভীষণ পরীক্ষা! যুবক সন্ন্যাসী ভোলানন্দ আজ বস্তুতঃই কঠোর পরীক্ষায় নিমগ্ন হইয়াছেন। সদ্‌গুরুর বিশেষ কৃপা ব্যতীত এই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া মানবের সম্পূর্ণ অসাধ্য। গুরুকৃপা ভোলানন্দের উপর সদাই বর্ষিত। তাই, অবিক্ষিপ্তচিত্ত ভোলানন্দ ধীরভাবে গিন্নিকে বলিলেন —"মা! আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি?" গিন্নি উৎসুক ভাবে বলিল—"হাঁ, বলুন।" ভোলানন্দ বলিলেন— "আপনারা যে এত বৎসর বিষয় ভোগ করেছেন তাতে কোন শান্তি পেয়েছেন কি?" গিন্নি ও শেঠ উভয়ে সমস্বরে বলিল—"না, শান্তি পেলে কি আর আজ বিষয় ত্যাগ করে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করতে উৎসুক হতাম? বিষয়ে শান্তি নাই।" ভোলানন্দ বলিলেন—"তবে মা! আপনারা যে বস্তুতে শান্তি পান নাই আমাকে তাহা গ্রহণ করতে

বল্‌ছেন কেন? আমিও ত তাতে কোন প্রকার সুখ পাব না, সুতরাং আপনারা আমাকে আর এপ্রকার অনুরোধ করবেন না"—এই বলিয়াই ভোলানন্দ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। শেঠজী ও তাহার স্ত্রী তাহাদের সকল প্রলোভনই যুবকের উপর ব্যর্থ হইল দেখিয়া প্রথমতঃ একটু দুঃখিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই যুবকের অমানুষিক ত্যাগ ও অমূল্য সদুপদেশের কথা স্মরণ করিতেই ভোলানন্দের উপর তাহাদের ভক্তি ও প্রীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; তাহারা উদ্দেশ্যে তাঁহাকে নমস্কার করিল। ভোলানন্দও সেখান হইতে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৺দ্বারকাভিমুখে রওনা হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[১]

হরিদ্বারে ভোলানন্দ

"কে ?"

"আমি—আপনার বাগানের মালী।"

"কেন এসেছিস্ ?"

"একটি কথা আছে।"

—বলিতেই মোহান্তজী দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন।

মালী বলিল, "স্বামিজী! আপনার বাগানে এক সাধু আসিয়াছেন। তিনি সর্পসঙ্কুল বাগানেই বাস করিতেছেন; আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার জন্য কোন ব্যবস্থা করুন।"

"যা, আমি একটু পরে আস্ছি" বলিয়া মোহান্তজী মালীকে বিদায় দিলেন। মালীও মোহান্তজীকে একটি প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

সাধুগণ-সেবিত পুণ্যভূমি গঙ্গাদ্বার হরিদ্বারের বাজারের মধ্যে একটি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতল গৃহে মোহান্ত স্বামী শিবদয়াল গিরি মহারাজ বাস করেন। তাঁহার অগাধ সম্পত্তি। হরিদ্বারের বহির্ভাগে গঙ্গার উপর তাঁহার একটি

বাগান বর্ত্তমান। তিনি উক্ত বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন মালী নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত মালীই মোহান্তজীকে উক্ত প্রকার সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কাল-বিলম্ব না করিয়া মোহান্তজী দ্রুতগতিতে বাগানে উপস্থিত হইয়া নবাগত সাধুর অপূর্ব্ব তেজোময় মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিলেন। মোহান্তজী কেবলমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, নবাগত সাধুটি প্রৌঢ় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ; কিন্তু তেজঃ ও কান্তিতে শত শত যুবককে যেন অতিক্রম করিতেছেন। "আপনি আমার গৃহে চলুন, আপনার কোন প্রকার কষ্ট হইবে না ; আমি ঐকান্তিকভাবে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিব"—বলিয়া মোহান্তজী সাধুটিকে তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মোহান্তজীর ভক্তিবিনম্র ব্যবহারে প্রীত হইয়া সাধুটি মোহান্তের সহিত তাঁহার বাড়ীতে উপনীত হইলেন। কিছুকাল সেখানে বাস করিয়া তীব্র বৈরাগ্যবান্ সাধুটি অট্টালিকার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া গঙ্গার উপর কুটীরে বাস করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মোহান্তজী অগত্যা সাধুটিকে নিজের বাগানে থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

৺দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট সময় পুণ্যভূমি হরিদ্বারে অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া ভোলানন্দ হরিদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। হরিদ্বারের

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া ভোলানন্দ সেখানে বাস করিতেই দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত হরিদ্বারে পূতসলিলা দক্ষিণ-প্রবাহিণী ভাগীরথীর দিবারাত্র কুলু কুলু ধ্বনি দর্শকের মনে এক স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার করিতেছে। এত জল কোথা হইতে আসিতেছে? সেই অতীতের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। কোথায় আজ সে ত্রেতাযুগ, কোথায় সে তপোনিরত পরোপকার-রত পিতৃভক্ত ত্যাগী রাজর্ষি ভগীরথ—যিনি রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজের পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার-সাধন-মানসে, গঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে আনিবার সঙ্কল্প করিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সাধনায় সিদ্ধ হইয়া যিনি মা জাহ্নবীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট, মা যাঁহাকে নিজের পুত্রবৎ স্নেহ করিয়াছেন। মা গঙ্গে, মা আমার! ভগীরথ তোকে যে প্রকারে ভক্তিতে বশ করেছেন, আমাদের ত সে ভক্তি নাই—সংসারের কঠোর আঘাতে পাষাণ হৃদয় আরও কঠিন হয়েছে—ভক্তিবারি সিঞ্চনে তাহা কখনও দ্রবীভূত হবে না। মা! তবে কি আমাদের কোন উপায় নেই, আমরা কি চিরদিনই এমনিভাবে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ভেসে ভেসে দুঃখের কবলে পতিত থাকব? অসুরধ্বংসকারিণী মা! তুই কৃপা করে আমাদের হৃদয় হতে কামাদি অসুরনিচয়কে দূর করে দে—তাদের সমূলে ধ্বংস করে দে। মা! সন্তান অবোধ বলে মা কি তাকে কোল দেয় না? সন্তান দুষ্ট

হলে—অসমর্থ হলে মা তার জন্য বিশেষ চিন্তিতা হন,—তার মঙ্গলের উপায় উদ্ভাবন করেন। তবে মা! তোর এ কি প্রকার বিপরীত ভাব? অজ্ঞ, সংসারসমুদ্র হ'তে উত্থানশক্তি-রহিত আমাদের হাত ধরে' মা! সংসারের পরপারে নিয়ে যাস্ না কেন? তোর নাম করুণাময়ী, পতিতপাবনী—কই, সে কি কেবল কথার কথা। মা! আমরা পতিত, তুই হাত ধরে' এ পতিতদের নিজের ক্রোড়ে টেনে নে—ভগীরথের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে ভক্তিবারি সিঞ্চন কর্—যেন অন্তিমে তোর অভয়পদে চিরশান্তি লাভ করতে পারি।

একদিকে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর অহর্নিশ কুলু-কুলুধ্বনি যেমন দর্শকের মনে অতীতের স্মৃতি উদয় করিয়া দেয়, অন্য দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হিমালয় পর্ব্বতের সুমনোহর দৃশ্যরাজি ততোধিক অতীতের স্মৃতি আনয়ন করে; হৃদয় এক অপার্থিব আনন্দে মগ্ন হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—সকল যুগেই সিদ্ধ-মুনি-ঋষি-সেবিত বিশাল অক্ষয় হিমালয় পর্ব্বত যেন সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া সকলকে নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদান করিতেছে—"রে অজ্ঞ জীব! তুই আজ দু দিনের জন্য জগতে এসে ভোগবিলাসে মগ্ন হয়েছিস্, নিজের ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক শরীরটার রক্ষণাবেক্ষণেই দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করছিস্; কোথায় ছিলি, কোথায় এসেছিস্ এবং কোথায়ই বা যাবি, তার কোনই খবর রাখছিস্ না। অজ্ঞ, মূর্খ! তোর কিছুতেই জ্ঞান হচ্ছে না, এই

একবার আমার প্রতি চেয়ে দেখ্, কত যুগ গত হয়েছে, আমি এখানে এমনিভাবেই দণ্ডায়মান আছি, ধীর-স্থির ভাবে চেয়ে চেয়ে জগতের খেলা দেখ্ছি, আর মনে মনে হাস্ছি। তোর মত কোটি কোটি প্রাণী আমি দেখ্তে দেখ্তে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তথাপি তোর জ্ঞান হচ্ছে না, এই নশ্বর সাড়ে-তিন-হাত দেহটাকেই 'আমি' বলে ভাবছিস্, শরীর হতে ভিন্ন নিজের সত্তাকে জান্তে চেষ্টা করছিস্ না। নিজেকে পণ্ডিত মনে করে অভিমানে স্ফীত হচ্ছিস্, কিন্তু মহা অজ্ঞের ন্যায় কাল যাপন কর্ছিস্। তুমি কে, তাহা পূর্ব্বে জ্ঞাত হও, পশ্চাৎ নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিও।

'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥'

'বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শী ব্যক্তিরাই পণ্ডিত-পদবাচ্য হইয়া থাকেন।'

তাই বলি, পূর্ব্বে নিজে যথার্থ পণ্ডিত হও, সর্ব্বভূতে এক আত্মচৈতন্য বিরাজমান, এটি উপলব্ধি কর, পশ্চাৎ পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিও। আর কতকাল এই মোহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে, এখনও সময় আছে, ইচ্ছা করিলে হে মানব! এই জন্মেই তুমি কৃতকৃত্য হইতে পার,—ভগবান্ লাভ করিতে পার—নিজের মনুষ্য জন্ম সফল করিতে পার।"

হিমালয়ের সুদৃশ্যরাজি ও কাল্পনিক উপদেশাবলী বস্তুতঃ দর্শকের—বিশেষতঃ ভাবুকের মনে এক অপার্থিব আনন্দ সঞ্চার করে। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বদিকে হিমালয় দ্বারা বেষ্টিত হরিদ্বার, পতিতপাবনী গঙ্গা দ্বারা পূত হরিদ্বার, সাধুগণ-সেবিত হরিদ্বার, দেশদেশান্তর হইতে আগত দর্শক দ্বারা পরিপূর্ণ হরিদ্বার, অহর্নিশ ব্যোম ব্যোম হর হর, নমঃ পার্ব্বতীপতে হর, গঙ্গামায়ীজিকী জয় প্রভৃতি ধ্বনিতে মুখরিত হরিদ্বার—বস্তুতঃই ভোলানন্দের মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিল। তিনি জীবনের অবশিষ্ট সময় হরিদ্বারে যাপন করিতেই ইচ্ছা করিলেন।

হরিদ্বারে মায়াদেবী, বিল্বকেশ্বর শিব এবং একক্রোশ পূর্ব্বে হিমালয়োপরি অবস্থিত চণ্ডীমন্দির দর্শন করিয়া ভোলানন্দ ব্রহ্মকমণ্ডলুতে অবগাহন করিলেন। দক্ষেশ্বর শিবজীকে দর্শন করিবার প্রবল ইচ্ছায় ভোলানন্দ দ্রুতপদ-বিক্ষেপে হরিদ্বার হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত কন্‌খলে দক্ষেশ্বর মন্দিরে উপনীত হইলেন। দক্ষেশ্বর শিবকে দর্শন করিতেই ভোলানন্দের মনে এক অপার্থিব ভাবের উদয় হইল। শিবভক্ত ভোলানন্দের স্মৃতিপথে শিবজীর অলৌকিক লীলারাশি উদিত হইল। হায়, ইহাই সেই স্থান—যেখানে মূঢ়, অভিমানী, শিবদ্বেষী দক্ষ প্রজাপতি শিববিহীন যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহাই সেই-স্থান—যেখানে শিব-প্রণয়িনী মা সতী পতিনিন্দা সহ্য

করিতে না পারিয়া পিতা দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধা ও বীতশ্রদ্ধা হইয়া শিবনিন্দুক পিতার শুক্র হইতে প্রাপ্ত শরীরকে পাপের আশ্রয়স্থল মনে করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক সমাগত দেবতা-ঋষিদের যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া নিজের শরীরকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাই সেই স্থান—যেখানে সতীবিরহ-দগ্ধ-হৃদয় শিবের ক্রোধাগ্নি হইতে উত্থিত বীরভদ্র দ্বারা দক্ষযজ্ঞ বিধ্বস্ত ও দক্ষরাজ বিনাশ-প্রাপ্ত হন। ইহাই সেইস্থান—যেখানে আশুতোষ শিবজীর কৃপায় মদগর্ব্বিত দক্ষ পুনর্ব্বার জীবন লাভ করেন কিন্তু পাপের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার স্কন্ধে ছাগমুণ্ড সংযোজিত হয়।

শিবের অলৌকিক লীলা স্মরণ করিতে করিতে ভোলানন্দ ধীরে ধীরে পুনরায় হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদ্বারে বাস করিবার প্রবল ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি হরিদ্বারের সকল স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিদর্শন করিলেন। কিন্তু কোথায়ও মনোমত স্থান না পাইয়া দুঃখিত চিত্তে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ গঙ্গাতীরে অবস্থিত মোহান্ত শিবদয়াল গিরি মহারাজের নির্জ্জন উদ্যান তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। তিনি সেই উদ্যানে যাইয়া উদ্যানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেইখানেই বাস করিতে অভিলাষী হইলেন। বাগানের পূর্ব্বদিকে স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী, তাহা হইতে একক্রোশ দূরে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত

অথচ দৃষ্টির অন্তর্ভূর্ত মা চণ্ডীদেবীর মন্দির; উত্তরে সর্ব্বত্যাগী শুধু কৌপীনমাত্রসম্বলিত ভস্মলেপিত নাগাসাধুদের জুনা আখ্ড়া, তাহা হইতে নয় ক্রোশ দূরে অথচ দৃষ্টিশক্তির অন্তর্ভূর্ত বিশাল হিমালয়ের উন্নত শাখারাজি; পশ্চিমে বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত যাত্রিবৃন্দ-সেবিত সাধারণ পথ এবং তাহা হইতে আধ ক্রোশ দূরে অথচ দৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত মা মনসা-দেবীর মন্দির; দক্ষিণে উপরে প্রশান্ত আকাশ, নিম্নে পূতসলিলা ভাগীরথীর তটোপরি অবস্থিত বিস্তীর্ণ ভূমি—ভাবুক ভোলানন্দের মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করিল। তিনি উক্ত উদ্যানেই বাস করিতে লাগিলেন। বাগানের মালী সর্পসঙ্কুল উদ্যানে ভোলানন্দ বাস করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার কোন বিপদ হইতে পারে মনে করিয়া বাগানের মালিক মোহান্ত স্বামী শিবদয়াল গিরিজীকে সংবাদ দিল। মোহান্তজীও ভোলানন্দের ব্যবহারে ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজের আচার্য্য গুরুপদে বরণ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

[২]

ভক্তজন-পরিবৃত ভোলানন্দ

'ওয়েল্ (Well) পাদ্রী! টোমকো কুছ্ চিজ্‌কা জরুরৎ হ্যাঁয়' * বলিয়াই এক সাহেব সাধুকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিল। সাধু, 'নেহি হামারা কুছ্ চিজকা জরুরৎ নহী' † বলিতেই সাহেব সহাস্যবদনে দোকানে চলিয়া গেল। সাধুর নির্লোভিতায় সাহেবটি তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইল ও মধ্যে মধ্যে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সহিত সাধুর নিকট উপনীত হইয়া নানাবিধ সদালাপ করিতে লাগিল। সাহেবদের ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিয়া সাধুটিও তাহাদের প্রতি সমধিক প্রীতিযুক্ত হইয়া কখনও বালকের ন্যায় হাস্য-পরিহাসে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, কখনও বা সুমধুর হৃদয়গ্রাহী আধ্যাত্মিক উপদেশ দানে রসিক সাহেবদের হৃদয়ে অধিকতর রস সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। সাহেবদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভারতবাসী—বিশেষতঃ বাঙালী জনসাধারণও ক্রমশঃ সাধুর নিকট সমবেত হইতে লাগিল। প্রেমের আধার সাধুও সহাস্যবদনে মধুর উপদেশ দ্বারা সমাগত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে আনন্দবারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দও আনন্দমূর্ত্তি সাধুর তেজোদীপ্ত

---

* তোমার কোন জিনিষের দরকার আছে কি?

† না, আমার কোন জিনিষের দরকার নাই।

কলেবর দর্শনে ও মধুর হৃদয়গ্রাহী উপদেশাবলী শ্রবণে তাঁহার প্রতি দিন দিন আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

হরিদ্বার লালতারাবাগ * আশ্রমে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া ভোলানন্দ মহানগরী কলিকাতা দর্শন মানসে বহির্গত হইয়া নানাস্থান ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইলেন। কলিকাতা হাটখোলায় তখন ইট, সুর্কি, চূণ প্রভৃতির ব্যবসায় চলিত। ভোলানন্দ কৌপীন-মাত্র পরিধান করিয়া কখনও বা নগ্ন অবস্থায় অনাবৃত স্থলে ইট, সুর্কির মধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন হাটখোলার নিকটস্থ দোকান হইতে একজন সাহেব ভ্রমণে বহির্গত হইয়া হঠাৎ উক্ত স্থানে ভোলানন্দকে দেখিতে পাইল। ত্যাগের প্রতীক্ ভোলানন্দের সাত্ত্বিক মূর্ত্তি দেখিয়া সাহেব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাহা করিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন। বাঙালী ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকেই ভোলানন্দের নিকট দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল। ভোলানন্দ বলিলেন—"দীক্ষা নিয়ে কি হবে, নিয়ম ত পালন করতে পারবে না। তোমরা বাঙালী—মাছ-মাংস না খেয়ে পারবে না; আমার কাছে দীক্ষিত হলে ওটি ছাড়তে হবে—তা তোমাদের দ্বারা হবে না; সুতরাং দীক্ষার দরকার নাই। যাও, কুলগুরুর নিকট হতে

* মোহান্ত স্বামী শিবদয়াল গিরিজীর বাগানটি লালতারাবাগ নামে অভিহিত হয়।

দীক্ষা গ্রহণ করে সাধন-ভজন করগে। সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা নিলে অনেক শক্ত নিয়ম পালন করতে হয়—তা তোমাদের দ্বারা হবে না।" ভোলানন্দের প্রতি আকৃষ্ট-চিত্ত এবং দীক্ষাগ্রহণে অতীব উৎসুক ভক্তবৃন্দ নম্রভাবে বলিল, —"তা কি কি নিয়ম পালন করতে হবে বলুন, আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করব—যাতে আমাদের দ্বারা নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়।" ভোলানন্দ বলিলেন—"মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি আমিষাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে, পরদার গমন করিতে পারিবে না, মিথ্যাকে বিষবৎ পরিহার করিতে হইবে। কাহাকেও গালি দিতে পারিবে না, পরনিন্দা এবং শপথ করিতে পারিবে না। কোন প্রকার মাদকদ্রব্য (মদ্য, গাঁজা প্রভৃতি) সেবন করিতে পারিবে না। জুয়াখেলা ও ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আয়ের দশ ভাগের একভাগ দানার্থে ব্যয় করিতে হইবে ; প্রত্যহ উষায় ও সায়ংকালে দেড় ঘণ্টা করিয়া পরমেশ্বরের ভজনে ব্যয় করিতে হইবে। প্রতিদিন সাধুসঙ্গ—তাহার অভাবে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ বা সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে হইবে। পিতামাতার চরণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহাদের চরণামৃত পান করিতে হইবে। পিতামাতা জীবিত না থাকিলে তাঁহাদের ধ্যান করিয়া মনে মনে প্রণাম করিতে হইবে এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ও কুগ্রন্থ পাঠ হইতে বিরত হইতে হবে। অন্ততঃ এইগুলি যদি করিতে পার, তাহা হইলে

আমার কাছে আসিও; এখন যাও, এই নিয়মগুলি পালন কর, ভবিষ্যতে দীক্ষা মিলিবে।”

দেখিতে দেখিতে ভোলানন্দের নাম বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দূরদূরান্তর হইতে দর্শনেচ্ছু ভক্তবৃন্দ ভোলানন্দের নিকট উপনীত হইতে লাগিল। ভোলানন্দও গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে নগ্ন অবস্থায় বা কৌপীন মাত্র পরিধান করিয়া অবস্থান করা ভদ্রোচিত ব্যবহার নহে মনে করিয়া এবং ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে তখন হইতে পুনরায় বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ জগতের হিতকল্পে যে সকল মহাত্মা জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন, মানববৃন্দকে অমৃতময় উপদেশাবলী প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদের নগ্নাবস্থায় অথবা শুধু কৌপীন পরিধান করিয়া থাকা সভ্য-জগৎ দ্বারা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। ভোলানন্দও ইহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া পুনরায় বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। বস্ত্র গ্রহণানন্তর ভোলানন্দের শরীরের কান্তি যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর শরীর দর্শনে ভক্তবৃন্দ তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইল ও অনেকেই তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া নিজেদের কৃত-কৃতার্থ মনে করিল। কিছুকাল বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাপন করিয়া ভোলানন্দ হরিদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত লালতারা-বাগেই বাস করিতে লাগিলেন। হরিদ্বার লালতারাবাগ

আশ্রম দেখিতে দেখিতে বাঙালী ভক্তবৃন্দের আবাসস্থল হইয়া উঠিল। ভোলানন্দের নাম শুনিয়া বাঙালী ভক্তবৃন্দ দীক্ষা-গ্রহণ মানসে, কেহ বা শুধু দর্শন করিবার জন্য লালতারাবাগ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ভোলানন্দও সমাগত ভক্তবৃন্দের যথোচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ দেখিল, ভোলানন্দের মধ্যে মাতার স্নেহ, পিতার ভালবাসা এবং সখার সখ্যভাব যেন একাধারে বিরাজমান; তাই লৌহ যে প্রকার স্বতঃই চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ভক্তগণও তদ্রূপ ভোলানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভোলানন্দের শিষ্যবৃন্দের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বঙ্গদেশে 'ভোলাগিরি' নামটি সুপরিজ্ঞাত হইল।

[৩]

প্রেমিক ভোলানন্দ

'ভাই যেও না, আমি তোমাকে যেতে বলছি না, শুধু দিয়াশলাইটির জন্য ওখানে হাত দিয়েছি'। সর্পটি ভোলানন্দের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তৎক্ষণাৎ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার ওপারে চলিয়া গেল। দুঃখিত হইয়া ভোলানন্দ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত প্রদীপ জ্বালিলেন না।

হরিদ্বার লালতারাবাগ আশ্রমে মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া ভোলানন্দ আনন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ তাঁহার নিকট অর্থ প্রেরণ করিতে লাগিল। ভোলানন্দ উক্ত অর্থ হইতে নিজের জন্য কপর্দ্দকও ব্যয় না করিয়া, নিজের মাধুকরী বৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাজার হইতে পুরী, লাড্ডু প্রভৃতি ক্রয় করিয়া হরিদ্বার ও কন্‌খল-নিবাসী সাধুবৃন্দকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে লাগিলেন। প্রত্যহ যত টাকা আসিতে লাগিল, তাহা সেই দিনেই ব্যয়িত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভোলানন্দের নাম সাধুসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাঁহার ত্যাগ ও সাধুসেবা, সকলের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি উৎপাদন করিল। তাঁহার শাস্ত্রানুরাগ ও শাস্ত্রে পারদর্শিতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া নির্ব্বাণী আখড়ার নাগা সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে আপনাদের মণ্ডলীশ্বর পদে বরণ করিলেন। ভোলানন্দও সকল নাগাদের গুরুপদে বৃত হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। নাগা সাধুরাও তাঁহার সুমধুর উপদেশ শ্রবণে ও অশেষ বুদ্ধিমত্তা দর্শনে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিতে পারিয়া নিজেদের কৃত-কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। এইভাবে সাধু-সমাজে সম্মানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াও ভোলানন্দ দীনাতিদীন ব্যক্তির ন্যায় সকলের সেবা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার

নিরহঙ্কার ও নির্ভীক্ ভাব দর্শনে এবং মধুর উপদেশ শ্রবণে জনসাধারণও ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সন্ন্যাসিগণ ভোলানন্দের মধুর সঙ্গ করিবার এবং অমূল্য উপদেশ শুনিবার জন্য আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইতে লাগিলেন। ভোলানন্দও সরল দৃষ্টান্তের সহিত জ্ঞানের গভীরতম উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সকলের হৃদয় মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

একদিন হরিদ্বারের এলাচিগিরি নামধেয় জনৈক সন্ন্যাসী ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ প্রেরিত অর্থদ্বারা যাহাতে আশ্রমে সাধুদের অন্ন-বস্ত্রের স্থায়ী ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি দিবার জন্য ভোলানন্দকে অনুরোধ করিলেন। ভোলানন্দও তাঁহার বাক্যানুযায়ী তখন হইতে আশ্রমে সত্র খুলিলেন। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে সাধুগণ আশ্রমে অন্নগ্রহণ করিতে লাগিলেন। আটা, চাউল, ডাল, ঘী প্রভৃতি নিত্য আহার্য্য জিনিষ দ্বারা আশ্রমের একটি গৃহ পরিপূর্ণ হইল এবং অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবার জন্য একজন পাচক নিযুক্ত হইল। ভক্ত ও শিষ্যগণের আগ্রহাতিশয্যে ভোলানন্দ তখন হইতে আশ্রমেই অন্নগ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে দিন গত হইতে লাগিল। ভোলানন্দ গুরুমহারাজ গোলাপগিরিজীর আদেশানুযায়ী তখনও রাত্রি তিনটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া শৌচাদিক্রিয়া সম্পাদন

পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া সাধন-ঘরে (গুহায়) গমন করিতেন। সাধন-ঘরের দেয়ালের গর্ত্তে স্থাপিত দিয়াশলাই দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়া আসনাদি যথাযথ স্থানে স্থাপন করিয়া তিনি সাধনে বসিতেন। একদিন প্রদীপ জ্বালিবার মানসে উক্ত গর্ত্তে হস্ত স্থাপন করিতেই একটি বিষাক্ত ফণাধারী বৃহৎ সর্প ফোঁস করিয়া উঠিল ও ভোলানন্দের কোন প্রকার অনিষ্ট-সাধন না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে প্রস্থান করিল। প্রেমিক ভোলানন্দের অনুরোধ উপেক্ষিত হইল—দুঃখিত হইয়া সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি অন্ধকারে যাপন করিলেন।

[৪]

স্বপ্নাদিষ্ট ভোলানন্দ

সুপ্তোত্থিত হইয়া ভোলানন্দ দ্রুতপদবিক্ষেপে শিব-নির্দ্ধারিত স্থানে গমন পূর্ব্বক খনন করিয়া দেখিলেন, বস্তুতঃই ভীষণ ফণাধারী সর্প-বেষ্টিত একটি সুন্দর শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান।

ভক্তজন পরিবেষ্টিত হইয়া ভোলানন্দ হরিদ্বারেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল ৭টা পর্য্যন্ত সাধন-ঘরে (গুহায়) অতিবাহিত করিয়া পশ্চাৎ প্রাতর্ভ্রমণ পরিসমাপনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আশ্রমের নিকৃষ্টতম কার্য্যও

স্বহস্তে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। সমাগত ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ দেখিল, ভোলানন্দ আশ্রমস্থ সেবকবৃন্দ-সহ কাপড় জামা গুটাইয়া দীনাতিদীন সেবকের ন্যায় আশ্রমের যথা-বিহিত কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতেছেন। অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও ভোলানন্দ প্রাচীন ঋষি-মুনিগণের ন্যায় পর্ণ-কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন ও 'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা' স্মরণ করিয়া এবং শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বেদ ও শাস্ত্রের বহির্ভূত হইয়াও গো, সাধু ও ব্রাহ্মণগণের সেবায় দিবারাত্রি রত থাকিলেন। ভক্তগণ যখন সাধুগণ-সেবিত হরিদ্বার ও কন্‌খলের অন্যান্য আশ্রম সকলের অভ্রভেদী সুচারুকার্য্য-সমন্বিত বিশাল অট্টালিকা সমূহ দর্শনে নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করিয়া লালতারাবাগ আশ্রমে উপনীত হইয়া পর্ণকুটীরে বিরাজমান ভোলানন্দের সুন্দর ও মধুর উপদেশাবলী শ্রবণ করিতে লাগিল, তখন তাহাদের মনে হইতে লাগিল, সেই পূর্ব্বযুগের তপোনিরত সর্ব্বত্যাগী পরোপকারী ঋষি-মুনিদের কথা; মনে পড়িতে লাগিল—সেই অতীতযুগের গৌরবমণ্ডিত প্রফুল্লচিত্ত সিদ্ধমহাপুরুষগণের সহাস্যবদন; মনে হইতে লাগিল,—সেই পুরাতনকালের আপন-ভোলা, অপরের গুণগ্রাহী সাধুভক্তবৃন্দের স্ব স্ব দেহের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থাভাব। সন্ধ্যাসমাগমে যখন দলে দলে গোসকল আশ্রমে আগমন করিতে লাগিল, যখন ভোলানন্দ তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক 'আও মা' বলিয়া সম্বোধন

করিতে লাগিলেন, যখন সুললিতকণ্ঠে ভক্তিবিনম্রচিত্তে ভোলানন্দ ভক্তবৃন্দসহ ভগবান শিবের স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, স্তোত্র-পাঠান্তে যখন গোমাতাকে প্রণাম করিয়া ভক্তবৃন্দকে সুমধুর আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, তখন বস্তুতঃই আশ্রমটিকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল— ত্রিতাপতপ্ত জীবের শান্তিবিধানার্থই যেন আশ্রমটি গঠিত হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ আশ্রমে উপনীত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি অনুভব করিতে লাগিল। শান্তিলাভের আশায় দূরদূরান্তর হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিতে লাগিল।

এই ভাবে দিনের পর দিন কোথা দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ভোলানন্দের তাহার প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই—তিনি আপন-ভোলা হইয়া জগতের হিতকল্পে দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

একদিন ভোলানন্দ নিদ্রায় অভিভূত, হঠাৎ স্বপ্নে ভগবান শিবজী তাঁহাকে বলিলেন, "ভোলা! আশ্রমস্থ উদ্যানে একটি শিবলিঙ্গ প্রোথিত আছে, তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক আশ্রমে প্রতিষ্ঠা কর।"

ভোলানন্দকে দেখিবামাত্রই সর্পটি স্থানান্তরে গমন করিল। ভোলানন্দ আনন্দিত হইয়া শিবলিঙ্গটিকে গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে 'গৌরীশঙ্কর' নাম

প্রদান করিলেন। তদবধি আশ্রমে সেই শিবলিঙ্গেরই পূজা চলিয়া আসিতেছে। *

[৫]

লব্ধচক্ষুঃ ভোলানন্দ

'দেখ্ ত ভোলা! আমরা কে?' অন্ধ ভোলানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, দিব্যমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় শিব ও পার্ব্বতী দণ্ডায়মান। 'এই যে আমার মা ও বাবা' বলিয়া ভক্তি গদ্‌গদচিত্তে ভোলানন্দ ভগবান শিব ও ভগবতী পার্ব্বতীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। শিবজী বলিলেন—'যা, আজ হ'তে তোর এক চক্ষুঃ লাভ হ'ল।' 'আচ্ছা বাবা! এতেই আমার কাজ চলে যাবে' বলিয়া ভোলানন্দ মাতা পার্ব্বতী ও পিতা শিবজীকে পুনরায় প্রণাম করিলেন। শিব ও পার্ব্বতী ভোলানন্দের মস্তকে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বৈতবাদী আপনাদিগকে ভগবানের দাস মনে করিয়া অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করে, তাহাদের বিবেক-বৈরাগ্যের বা জ্ঞানের লেশমাত্রও নাই, এই বলিয়া কত-শত নকল জ্ঞানী, দেহাধ্যাসী বেদান্তবাদী বক্তৃতার ছটায় দিগ্‌দিগন্তর মুখরিত করিয়া জনসাধারণ হইতে 'বাহবা' গ্রহণ করিতেছে;

---

* ভোলানন্দ লেখককে বলিতেন—"বেটা! এই শিব বড় প্রত্যক্ষ, একটু ভক্তি ও শ্রদ্ধা রেখে পূজা কর্, অচিরেই ফল পাবি।"

শরীরকেই আত্মা মনে করিয়া, শরীরকেই ব্রহ্মভাবে ভাবনা করিয়া, নিজেদের দুঃখের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি করিতেছে— লোকের কাছে বেদান্তবাদী সাধু সাজিয়া শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতেছে। কিন্তু মন সেই বিষয়-ভোগে লিপ্ত, হৃদয় কামাদি রিপুদ্বারা সন্তপ্ত; মন জগৎ-মরীচিকায় জলভ্রমে ধাবিত—হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আসুরিক সম্পদ্ দ্বারা কলঙ্কিত মন তত্ত্ব-জ্ঞানের আভাস গ্রহণেও অশক্ত। হায় নকল জ্ঞানী! তোমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া বস্তুতঃ হাসিও পায়, কান্নাও আসে। হাজার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত মুনি-ঋষিরা হিমালয়ের তুষারের মধ্যে কঠোর তপোনিরত থাকিয়াও যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিতেন না, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রও যে আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশক্রমে একশত বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন, যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য ঔদ্দালকি নাচিকেতা স্বর্গভোগ ও অমরত্বকেও কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—কতিপয় বেদান্ত গ্রন্থ আলোচনা করিয়াই যদি সেই আত্মতত্ত্ব লাভ করা সম্ভব হইত, তবে আর সাধন-ভজনের কোন প্রয়োজনই অনুভূত হইত না, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের দরকারও উপলব্ধি হইত না। বস্তুতঃই অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির পক্ষে বেদান্তগ্রন্থ আলোচনা সাধন-রাজ্যের প্রধান অন্তরায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিষয়ে ধাবমান মন, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত চিত্ত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে কখনই সক্ষম হয় না। তাই ভগবান অজ্ঞানীদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া মুক্তিলাভের সহজপন্থা কর্ম্মযোগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবানে মনঃ ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত সকল কর্ম্ম করিয়া যাও, ভক্তিসহকারে একান্তে বসিয়া তাঁহার ধ্যান ও পূজায় তন্ময় হও, অহর্নিশ তাঁহার নাম ও গুণ কীর্ত্তন কর; দেখ ধীরে ধীরে তোমার জীবনে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় কি না, শান্তির শীতল বারি দ্বারা ত্রিতাপতপ্ত মন ধৌত হয় কি না। 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি' শ্রীভগবানের এই কথাটির উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক নিজের হৃদয়াকাশে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যানে বসিয়া যাও, দেখ শান্তি মিলে কি না। বস্তুতঃই ভগবান আমাদের অন্তরতম, চিরসুহৃৎ। তাঁহাকে ভুলিয়া জগতের অনিত্য বিষয়-সুখের পিছনে পিছনে ছুটিয়া আমাদের মন ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে, তাই আমরা 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া জীবন-সংগ্রামের কঠোর পরীক্ষার পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, সাধন-বলে করুণাময় পরমেশ্বরের অগাধ করুণার একবিন্দু লাভ করিতে পারিলেও আমাদের জীবন শান্তিময় হইয়া উঠিবে। ভক্তিবারি-সিঞ্চনে কঠোর হৃদয়কে কোমল করিতে পারিলেই শান্তিলাভ অনিবার্য্য। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান হয় না, ইহা দৃঢ়রূপে অবগত হইয়া জ্ঞানের সাধন ভক্তির শরণাগত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

ভক্তিলাভ করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভ অনিবার্য্য—জ্ঞানেই মোক্ষ। সুতরাং ভক্তি-শূন্য জ্ঞান অর্জ্জন করিতে যাইয়া নিজেদের দুঃখ বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা অনুচিত।

ভক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞানী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রামচন্দ্র উপবিষ্ট আছেন। হনুমান্ শ্রীরামের সেবায় রত। রামচন্দ্র হনুমান্‌কে প্রশ্ন করিলেন—'বৎস হনুমান্! বল ত তুমি কে?' রামচন্দ্রের প্রশ্ন শুনিয়া হনুমান্ মহাচিন্তাকুল হইলেন। তিনি ভাবিলেন—আমি এখন কি উত্তর দেই, যদি বলি আমি শ্রীরামের দাস, তাহা হইলে উপস্থিত ব্রহ্মজ্ঞানিগণ আমার বাক্যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা মনে করিবেন, 'হনুমানের জ্ঞানের লেশমাত্রও নাই, যে-হেতু এখনও সে নিজেকে দাস বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে'। অপর পক্ষে আমি যদি নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মনে করিবেন 'হনুমানের বিন্দুমাত্রও ভক্তি নাই, সে নিজেকেই ব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করিতেছে, ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন।' হনুমান ভাবিতে লাগিলেন—'তাই ত কি উপায়ে ভক্তগণ ও জ্ঞানিবর্গ উভয়কেই সন্তুষ্ট করা যায়।' অনেক চিন্তার পর বুদ্ধিমান হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—

'দেহদৃষ্ট্যা দাসোঽহম্ জীববুদ্ধ্যা তদংশকঃ।
আত্মদৃষ্ট্যা তদেবাহং ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥'

অর্থাৎ—'হে রামচন্দ্র! দেহ-দৃষ্টিতে আমি আপনার দাস, জীববুদ্ধিতে আমি আপনার অংশ এবং আত্ম-দৃষ্টিতে বস্তুতঃ আমি ও আপনি এক—উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ'।

হনুমানের এবম্প্রকার যথার্থ উত্তর শুনিয়া সমাগত সকলেই অতীব প্রীত হইলেন এবং ভক্তবীর হনুমানের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পাঠক! হনুমানের অমূল্য বাক্য নিজের জীবনেও প্রতিফলিত করুন। যতদিন পর্য্যন্ত দেহাভিমান বর্ত্তমান থাকে, নিজেকে ভগবানের দাস ভাবিতে অভ্যস্ত হউন—তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার সেবায়, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে তন্ময় থাকুন। ভগবানের কৃপায় ও সাধনবলে ধীরে ধীরে অন্তরের মলিনতা দূরীভূত হইলে জ্যোতির্ম্ময় অজ, অমর, অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব যখন ক্ষণিকের জন্যও উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখন নিজেকে ব্রহ্মভাবে ভাবনা করুন—দেখুন অফুরন্ত আনন্দ অনুভূত হয় কি না, বেদান্তের 'আমিই ব্রহ্ম' এ ভাবটির সত্যতা যথার্থরূপে উপলব্ধি হয় কি না। বস্তুতঃ ভগবানের কৃপা ব্যতীত জগতে কেহই সাধন-রাজ্যে উন্নতিলাভ করিতে পারে না; তাই একনিষ্ঠ হইয়া ভগবানের উপর বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক সাধন-ভজন করিয়া যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। সময় হইলে তিনিই সকল করিয়া দিবেন। ছোট ছেলেটি মা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানে না, সে মাতার কাপড়ের অঞ্চল ধরিয়া চলিতে থাকে;

মাতাই তাহাকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রকৃত ভক্তও ভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হন না। ভগবান্ই তাঁহার পরম আশ্রয়স্থল। ভগবান্ও তাঁহাকে পাপের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার মনকে বিভূষিত করিয়া এই শরীর বর্ত্তমানেই মোক্ষ প্রদান করেন।

একই স্ত্রী—পুত্রের কাছে মা, স্বামীর কাছে স্ত্রী, শাশুড়ীর কাছে বধূ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ এক ভগবান্ই বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন রুচি-অনুযায়ী কাহারও নিকট বিষ্ণু, কাহারও নিকট শিব, কাহারও নিকট কালী প্রভৃতি বিভিন্নভাবে আবির্ভূত হন। বস্তুতঃ, ভগবান্ একজন। হনুমান্ বলিয়াছিলেন ঃ—

'শ্রীরামে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্ব-রামঃ কমললোচনঃ॥'

অর্থাৎ—'আমি জানি, শ্রীরাম ও জানকীনাথ উভয়েই বস্তুতঃ অভেদ, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।' ইহারই নাম 'ইষ্টনিষ্ঠা'। ভক্তও জানেন, শিব, বিষ্ণু, কালী প্রভৃতি বস্তুতঃ অভেদ, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে একজনের উপর নিষ্ঠা রাখিয়া ভক্ত সাধন করিতে থাকেন—তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান মনে করিয়া নিজেকে তাঁহার চিরদাস ভাবিয়া তাঁহার সেবা, ধ্যান ও গুণকীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করেন। উত্তরকালে ইষ্টের কৃপায় তাঁহার তত্ত্ব উপলব্ধি হয়—তিনি

দেখেন, সকলই তাঁহার ইষ্ট ; দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, ভূত, পিশাচ, উরগ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলই তাঁহার ইষ্ট—তাঁহার ইষ্টই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে খেলা করিতেছেন। সকলই যখন ইষ্টমূর্ত্তি, তখন সাধক নিজেকেও ইষ্ট হইতে অভেদরূপে দেখিতে পান; তাঁহার জীবত্ব নষ্ট হইয়া যায়—তিনি শিবরূপে বিরাজ করিয়া শিবময় জগৎ পরিদর্শন করেন—তাঁহার মনুষ্য-জন্ম সফল হয়।

ভোলানন্দও বিষ্ণু, শিব, কালী প্রভৃতি এক—সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াও শিবজীকেই নিজের ইষ্ট মনে করিয়া ভক্তি ও প্রেমের সহিত তাঁহার উপাসনা, পূজা প্রভৃতিতে তন্ময় থাকিতেন। জ্ঞান-লাভান্তে তিনি নিজেকে এবং জগৎকে শিব হইতে অভিন্নভাবে দর্শন করিলেন এবং পূর্ব্ববৎই ইষ্টদেব শিবজীর উপাসনা করিতে লাগিলেন; পরাভক্তি লাভ করিয়া নিজেকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিলেন। প্রারব্ধ-ভোগ অনিবার্য্য। দেখিতে দেখিতে লব্ধজ্ঞান ভোলানন্দের উভয় চক্ষুতেই ছানি পড়িল; তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইল। ভোলাগিরি নামে একজন মাড়ওয়ার দেশের সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মানন্দ নামে একজন হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী তখন ভোলানন্দের সেবায় দিবারাত্রি রত থাকিতেন। ভোলাগিরিজী ভোলা-নন্দের হাত ধরিয়া তাঁহার দৈহিক কার্য্য সম্পাদন করাইতেন এবং ব্রহ্মানন্দজী আশ্রমের অন্যান্য কার্য্যাদিতে সময় অতিবাহিত করিতেন। অনেক সুচিকিৎসার পরও যখন

ভোলানন্দের দৃষ্টিশক্তি লাভ হইল না, তখন অগত্যা দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া ভোলানন্দ প্রফুল্লমনে অন্তিমকালের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে মাড়ওয়ারী সাধু ভোলাগিরিজীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। ভোলানন্দের প্রতি আকৃষ্ট-চিত্ত ভোলাগিরিজী দুঃখ ও নৈরাশ্যের করাল কবলে পতিত হইয়া দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন। ভোলানন্দের দৃষ্টিশক্তি অপ্রাপ্তিতে ভোলাগিরিজী বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন, এবং মনে হইল. তিনি নিজের দৃষ্টিশক্তি ক্ষুন্ন করিয়াও ভোলানন্দের দৃষ্টিশক্তি পুনঃ-প্রদান করিতে পারিলে তাহা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বস্তুতঃই প্রেমের অদ্ভুত লীলা। দেখিতে দেখিতে ভোলাগিরিজী মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। মৃত্যু সন্নিকট, অন্ধ ভোলানন্দ ভক্ত ভোলাগিরির নিকট দণ্ডায়মান। ভোলাগিরিজী দেখিলেন, অন্ধ ভোলানন্দ তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান। 'হায়, মৃত্যু সময়েও ভোলানন্দকে অন্ধ দেখিয়া মরিতে হইল'!—ভোলাগিরিজী একাগ্রমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন—'ভগবন্! আমি ত মরিতে বসিয়াছি, আমার এই চক্ষু ভোলানন্দ যেন পান।' দেখিতে দেখিতে ভোলানন্দ-ভক্ত ভোলাগিরিজীর শাশ্বত আত্মা নশ্বর পঞ্চ-ভূতাত্মক শরীর পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময়ধামে চলিয়া গেল। ভোলানন্দও শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নিজের কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ভগবান শিবজী ভোলানন্দের দ্বারা ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে মনে করিয়া এবং ভোলানন্দ-ভক্ত ভোলাগিরিজীর মৃত্যুকালীন ঐকান্তিক প্রার্থনার বশবর্ত্তী হইয়া আজ ভোলানন্দকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিলেন। ভোলানন্দও ইষ্ট-কৃপায় দৃষ্টিশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া মানবের কল্যাণার্থ দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম ও অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ত্রিতাপ-তপ্ত মানব-মন ভোলানন্দের উপদেশ-বারি দ্বারা শীতল হইল। লোকহিত-ব্রত ধারণ করিয়া ভোলানন্দ জগতে বিচবণ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[১]

সমাধিস্থ ভোলানন্দ

"তীর্থে এসেছ, তীর্থকে কিছু দিতে হয়, তুমি কি দিবে ?"

উন্মুক্তচিত্তে নবদ্বীপচন্দ্র বলিলেন—"আপনি অন্তর্য্যামী, আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই দিব ; আপনার নিকট আমার অদেয় কিছুই নাই।" হঠাৎ সুললিত কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ভোলানন্দের সমাধি হইল। চক্ষুঃ হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। উপস্থিত ভক্তবৃন্দও অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই শুভমুহূর্ত্ত, পবিত্র সুরধুনীতট, তীর্থগৌরব ভোলানন্দের ন্যায় মহারত্ন দর্শন, তাঁহার শ্রীমুখনির্গত অমৃতময় বীজযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র, বেদগোপ্য ওঁকার-ধ্বনি, প্রেমাশ্রুযুক্ত লোভনীয় ও কমনীয় মুখশ্রী, সমাগত ভক্তবৃন্দের—বিশেষতঃ ভক্ত নবদ্বীপচন্দ্রের জীবন আনন্দময় করিয়া রাখিল। নবদ্বীপচন্দ্র ভাবিল, 'আর কেহই ভোলানন্দের এবম্প্রকার দর্শন পায় নাই।' সমাধিভঙ্গের পর ভোলানন্দ সস্নেহে ভক্তবৃন্দকে বলিলেন—"যাও বৎসগণ !

তোমাদের তীর্থ-দর্শন সফল হইবে। যতদিন সংসারে থাক, আয়ের অন্ততঃ দশভাগের একভাগ সৎকার্য্যে ব্যয় করিও।" নবদ্বীপচন্দ্র বলিলেন—"আপনার দর্শন আবার কবে পাব ?" ভোলানন্দ বলিলেন—"দর্শনের জন্য ব্যস্ত হইও না। একবার দর্শনই দর্শন ; যখন সময় হবে, তখনই দর্শন মিলবে। আমরা ত বসেছি প্রেমদান করতে, কিন্তু নেয় কে ? সব রোগী-ভোগীর দল।"

যুগ-যুগান্তর গত। জগতের বক্ষে কত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন, আবার অন্তর্হিত হইলেন। ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁহাদের সেবা, উপাসনা, স্তুতি প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকা ক্বচিৎ ভাগ্যবানের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকিবে। 'তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েৎ ভূতিকামঃ'—নিজের মঙ্গল-বিধানেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে মহাপুরুষের সেবাই একমাত্র মুখ্য উপায়। তাই শ্রুতি কৃপাপরবশ হইয়া মানবকে উপদেশ দিতেছেন—"হে মানব ! যদি তুমি নিজের হিতাকাঙ্ক্ষা কর, যদি এই জীবনেই কৃত-কৃত্য হইতে চাও, যদি সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ভগবদ্বুদ্ধিতে মহাপুরুষের উপাসনায় তন্ময় হও, তাঁহার কৃপাতেই তুমি উত্তরকালে তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারিবে।" মহাপুরুষ বা সদ্‌গুরুর কৃপাব্যতীত মোক্ষলাভ বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় একান্তই অসম্ভব। কিন্তু অজ্ঞ মানব মহাপুরুষের—জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কার্য্যাবলীতে দোষার্পণ পূর্ব্বক অহরহঃ তাঁহাদের নিন্দায়

জিহ্বা কলঙ্কিত করিতেছে। তাঁহাদের অলৌকিক ক্রিয়া বা প্রেম-ভক্তির স্ফুরণকে সাময়িক ভাবের প্রাবল্য মনে করিয়া তাঁহাদের জীবনের বিশেষত্ব, মাধুর্য্য গ্রহণে অশক্ত হইতেছে। তাঁহাদের স্তুতি, পূজা, উপাসনায় তন্ময় থাকা ত দূরের কথা, অধিকন্তু তাঁহাদের দোষকীর্ত্তন পূর্ব্বক নিজেদের পাপময় অশান্তিপূর্ণ জীবনকে অধিকতর পাপময় ও অশান্তিপূর্ণ করিতেছে। স্থূল শরীর যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত সকল পুরুষের মধ্যেই গুণ, দোষ উভয়ই লক্ষিত হয়। মহাপুরুষদের স্বভাবেও তাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। তাই শ্রীরামচন্দ্রের অন্যায়ভাবে বালিবধ, শ্রীকৃষ্ণের পর-স্ত্রী সঙ্গে বিহার, শঙ্করাচার্য্যের সকল মন্দিরে নিজের দেশের দক্ষিণী ব্রাহ্মণ নিয়োগ প্রভৃতি দোষ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তাঁহারা ভগবানের অবতার বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন; সে-সম্বন্ধে হিন্দুমতাবলম্বী ব্যক্তির সংশয়ের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। বস্তুতঃই, ধীর বুদ্ধিমান্ আত্মার কল্যাণকামী ব্যক্তি কখনও অপরের দোষের প্রতি দৃষ্টি দেন না; পরন্তু ভ্রমর যে প্রকার সকল ফুল হইতে মধু আহরণ পূর্ব্বক মধুচক্র রচনা করে, তদ্রূপ সকল জীবের নিকট হইতে তাহাদের গুণ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের জীবনটি গুণময় করিয়া তুলেন—পরগুণের কীর্ত্তন দ্বারা ও দোষের উপেক্ষা-পূর্ব্বক হৃদয়ে অফুরন্ত আনন্দ উপলব্ধি করেন। অপর পক্ষে পরনিন্দুক পর-দোষদর্শী ব্যক্তি পরচ্ছিদ্রান্বেষণ-তৎপর থাকিয়া

অহর্নিশ অশান্তির আগুনে জ্বলিয়া মরে। মহাপুরুষগণের কার্য্যে দোষ দর্শন পূর্ব্বক নিজেদের জীবনটিকে অধিকতর দুঃখময় না করিয়া প্রত্যেক মানবেরই তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব ও প্রেমের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত। সেই পর-হিতে জীবনোৎসর্গ, ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ, অহর্নিশ ভগবৎ-চর্চ্চা বস্তুতঃই লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু অজ্ঞ মানবের সে ক্ষমতা নাই—তাই দুর্য্যোধন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ অবলোকন করিয়াও তাঁহাকে ভগবান বা নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে নাই; অধিকন্তু বিশ্বরূপ দর্শনকে যাদুবিদ্যা মনে করিয়া অধিকতর শ্রীকৃষ্ণ-নিন্দায় রত হইয়াছিল। হৃদয় স্বচ্ছ না হইলে, হিংসা দ্বেষ কুটিলতা প্রভৃতি আসুরিক সম্পদ হইতে মন মুক্ত না হইলে ভগবান বা মহাপুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেও তাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধিতে অবলোকন করা যায় না। যাঁহাদের হৃদয় ভক্তি-মন্দাকিনীর অমৃতধারায় পূত হইয়াছে, তাঁহারাই ধ্যান-বলে মহাপুরুষ বা ভগবানের স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারেন। স্বচ্ছহৃদয় ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষের দর্শনমাত্রই বুঝিতে পারেন ইনিই ভগবানের সচল বিগ্রহ,—লোকহিতার্থে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন।

ভোলানন্দও শিবত্বলাভপূর্ব্বক লোকহিতার্থে হরিদ্বারেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কখনও কখনও পরিভ্রমণার্থ দেশদেশান্তরে গমন করিতেন। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার

মধুর সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তিনিই ভোলানন্দের সহাস্য সুন্দর বদন ও প্রেম-ভক্তির আবেশ দর্শন এবং জ্ঞানের গভীরতম উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। বস্তুতঃ, লেখকও অনেক সাধু-মহাপুরুষের দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে কিন্তু উন্মুক্তহৃদয়, কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের সমন্বয়, পরহিতার্থে অক্লান্ত পরিশ্রম, নিজের দেহের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থাভাব, শুধু ভোলানন্দের মধ্যেই দর্শন করিয়াছে।

বদরিকাশ্রম দর্শন করিবার জন্য চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপ-চন্দ্র রায় নামে কোন এক ভক্ত হরিদ্বারে উপনীত হইলেন। হাতরাস ষ্টেশনে তাঁহার পা ফাটিয়া একটু বেদনা হয়, তাই সঙ্গীদের সহিত ভ্রমণে বহির্গত না হইয়া হরিদ্বার ব্রহ্মকমণ্ডলুর ঘাটে সান্ধ্যসমীরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপচন্দ্রের দেশীয় ও গুরুস্থানীয় পণ্ডিতপ্রবর শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় ভোলানন্দের দর্শনেচ্ছু হইয়া সেস্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন। ভোলানন্দও তখন অদূরে ব্রহ্মকমণ্ডলুর ঘাটের উপর উদাসমনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সঙ্গে তিন চার জন ভক্ত। শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়ের দর্শন লাভপূর্ব্বক ও তাঁহার নিকটে ভোলানন্দের বিষয় অবগত হইয়া নবদ্বীপচন্দ্র অনতিবিলম্বে পণ্ডিতজীর সহিত ভোলানন্দের নিকটে উপনীত হইলেন। ভোলানন্দকে দর্শন করিবামাত্রই তাঁহার প্রতি নবদ্বীপের স্বভাবতঃই ভক্তি জাগ্রত হইল।

ভোলানন্দকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য নবদ্বীপের ইচ্ছা হইল, কিন্তু হঠাৎ প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস হইল না। অন্তর্য্যামী ভোলানন্দ ব্রহ্মকমণ্ডলুর জল স্পর্শ করিবার সময় বলিলেন,—"তোমাদের কাহারও কাহারও ইচ্ছা যে, আমি বসে একটু আলাপ করি।" ভোলানন্দের শ্রীমুখ হইতে এই কথা নির্গত হইবামাত্রই নবদ্বীপের ভয় দূরীভূত হইল। তিনি উন্মুক্ত হৃদয়ে ভক্তিবিনম্রচিত্তে প্রাণের আবেদন জ্ঞাপন করিলেন। ভোলানন্দও সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তীর্থে এসেছ, তীর্থকে কিছু দিতে হয়, তুমি কি দিবে।" তারপরই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ভোলানন্দের সমাধি হইল। ভক্ত নবদ্বীপচন্দ্র-ভোলানন্দের সেই রূপ দেখিয়া ভক্তিতে বিহ্বল হইলেন। সে কি অপরূপ রূপ—যে দেখিয়াছে সে উপলব্ধি করিয়াছে; ভাষা বা লেখনীদ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায় না। নবদ্বীপ-চন্দ্র মনে করিলেন "ভোলানন্দের এবম্প্রকার রূপ কেহ কোন দিন দেখে নাই, ভবিষ্যতেও দেখিবে না; এরূপ মধুর উপদেশ কেহ কোন দিন শুনে নাই, ভবিষ্যতেও শুনিবে না। তাই তিনি পুনরায় ভোলানন্দের দর্শনে অনিচ্ছুক হইয়া চট্টগ্রাম হইতে ভোলানন্দের নিকট চিঠি লিখিলেন ঃ—

শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন এই—

"বাবা !.........

*　*　*　*

তখন আপনি গঙ্গাতীরে সান্ধ্যসমীরে উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যেই সুশোভিত হইয়া আমার নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করিতে-ছিলেন। অহো! সে দর্শন বুঝি অনেকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। আপনাকে সেদিন যে রূপের ভিতর দেখিয়াছি, আবার সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যদি সে রূপ দেখিতে না পাই, সেই ভয়ে আপনাকে পুনরায় দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। যে অমৃতময়ী বাণী সেদিন আপনার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, সেরূপ বাণীও বোধ হয় আর শুনিব না।”

সেইদিন হইতেই ভোলানন্দের প্রতি নবদ্বীপচন্দ্র দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন। ভগবানের সচল বিগ্রহ জ্ঞানে উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

[২]

মৃতে প্রাণপ্রদানকারী ভোলানন্দ

“জীবিত ছেলেকে শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়ে তার জন্য কাঁদছিস্ কেন? এই নে তোর ছেলে।” বলিয়াই ভোলানন্দ রোরুদ্যমানা স্ত্রীলোকটির হাতে তাহার পঞ্চদশবর্ষীয় একমাত্র পুত্রকে অর্পণ করিলেন। স্ত্রীলোকটি মৃত পুত্রকে লাভ করিয়া হর্ষের প্রাবল্যে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরক্ষণেই ভোলানন্দের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

মানব যাহাকে অলৌকিক ও বিস্ময়কর মনে করে, যে কার্য্য করা বা বাক্য বলা মানব-বুদ্ধির অগম্য, যে কার্য্য দেখিলে মানব বিস্ময়ে অনেক সময় নিজেকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়,—মহাপুরুষগণের নিকটে তাহা বালক-বালিকার পুতুল-

খেলার মত প্রতিভাত হয়। প্রবাহ-রূপে অনাদিকাল হইতে এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, দুঃখ সঙ্কুল জগৎ বর্ত্তমান। প্রকৃত সুখের প্রয়াসী হইয়া জীব অহর্নিশ কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। স্ত্রী-সম্ভোগই জাগতিক সুখের চরম পরিণতি; এতদ্ব্যতীত যশঃ, মান, বিদ্যা, ধন প্রভৃতিও সুখের গৌণ উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভূমানন্দ এই জাগতিক বস্তু হইতে লাভ করা আকাশ-কুসুমবৎ বস্তুতঃই অসম্ভব। জাগতিক সুখ রজোগুণ-সম্ভূত, সুতরাং পবিত্র ও নির্ম্মল নহে। ভগবান তাই বলিয়াছেন—

'বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥'

অর্থাৎ—'যে সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, যে সুখ প্রথমে অমৃতের ন্যায় (প্রিয়) কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় (অপ্রিয়) হয়, সেই সুখকে রাজস সুখ বলা হয়।' ভগবান শঙ্করাচার্য্যও ভোগের আপাত-রম্যতা জ্ঞাপন করিয়াছেন ঃ—

"সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ।
পশ্চাজ্জায়তে শরীরে রোগঃ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণম্।
তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্॥"

স্ত্রী-সম্ভোগের পরিণাম দুঃখ, তাহা প্রত্যেক মনীষীই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন; অজ্ঞ

মানবও যে তাহা অস্বীকার করিতে পারেনা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি এই কাম-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য কি সভ্য জগৎ, কি অসভ্য জগৎ সকলেই যেন উৎকণ্ঠিত। সংযমের বাঁধ যেন ভগ্নাবস্থায় পতিত। মূর্খ, বিদ্বান, ধনী, দরিদ্র সকলেই প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলিয়াছে। কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযমে প্রয়াসী হইয়াও বিফল-মনোরথ হইতেছে। প্রবল তৃষ্ণাস্রোত সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া মানব-মনকে প্লাবিত করিতেছে। মানব ইচ্ছা করিলেও এই তৃষ্ণাস্রোতের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারিতেছে না। পিতামহের শাশ্বত আত্মা নশ্বর শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু পূর্ব্বেই অজ্ঞাতদেশে চলিয়া গিয়াছে, স্নেহময়ী মাতৃদেবীর কোমল ক্রোড় আর ইহ জগতে নাই, স্নেহময় পিতৃদেবের পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মে পরিণত হইয়াছে, পূজনীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, অভিন্নহৃদয় চিরসুহৃৎ আজ আর ইহ জগতে নাই। চতুর্দ্দিকে প্রত্যহ কত শত জীবকে নির্ম্মম কাল গ্রাস করিতেছে, তথাপি মানবের নিজের দেহের উপর অনাস্থা বা বৈরাগ্য আসে না। অধিকন্তু, নিজেকে দেহ হইতে অভিন্ন মনে করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন ও সুখ বিধান করিবার জন্য অহর্নিশ কতপ্রকারই পাপ, অতিপাপ ও মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতেছে। ‘পর-স্ত্রী-হরণ মহাপাপ, পর-স্ত্রী-গমনকারীকে অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা

ভোগ করিতে হয়, কুলটা স্ত্রী নরকের দ্বারস্বরূপ'—বাল্যাবধি শিক্ষক বা পুস্তক হইতে অবগত হইয়াও যৌবনে কত শত ব্যক্তি পরস্ত্রীতে রত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম-পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা পাপ, সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়াও সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিতে লক্ষ লক্ষ বার ভ্রমণ ও অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া এই দুর্লভ মোক্ষের দ্বার মানব-জন্ম লাভ করিয়াও মানব নিজের স্বরূপ সন্ধান হইতে বিরত হইতেছে, ভগবানে বিশ্বাসহীন হইয়া বিষয়ানন্দে মগ্ন হইতেছে। চার্ব্বাকের মত যেন জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' ভাবটাই জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু মানব! তুমি ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হও, বা বিশ্বাসহীন হও, তাহাতে ভগবানের কোনই লাভ বা ক্ষতি নাই। যদি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিয়া ভগবানের উপাসনায় তন্ময় হইতে পার, তবে দেখিবে, অচিরেই তোমার হৃদয় হইতে সন্তাপত্রয় দূরীভূত হইয়াছে, জগতে দুঃখ বলিয়া কোন জিনিষই বর্ত্তমান নাই; কেবল সুখ, কেবল শান্তি, কেবল আনন্দ। ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সাধন-ভজন কর, অনিত্য স্ত্রী-সম্ভোগ হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া ভগবানের চরণে সন্নিবেশিত কর, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, দেখিবে, অচিরেই তোমার জীবত্ব অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়া যাইবে; তত্ত্বজ্ঞানে তোমার মন বিভূষিত

হইবে—তুমি শিবরূপ হইয়া এই জগতেই চিরশান্তি লাভ করিতে পারিবে। বিষয় হইতে মনকে ভগবানে নিবিষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াও কতশত সাধক অকৃতকার্য্য হইতেছে। পঞ্চতন্মাত্রা যেন বলপূর্ব্বক মানব-মনকে বিষয়ে নিবিষ্ট করিতেছে ; তাই বহু সাধক ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া বিষয়স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিতেছে। বস্তুতঃই এ পথটি অতীব দুর্গম, তাই ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনী হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥"

অর্থাৎ—"যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও পরিণামে অমৃতের ন্যায় হয়, সেই স্থিরবুদ্ধির প্রসন্নতার ফলস্বরূপ সুখই সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া অভিহিত হয়। হে কুন্তীনন্দন! বিবেকী পুরুষ প্রযত্নপর হইলেও, বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়নিচয় বলপূর্ব্বক তাহার মনকে হরণ করিয়া থাকে।"

অপিচ শ্রুতি বলিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।
প্রাপ্য বরান্নিবোধত ॥
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥"

"হে জীব! মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও, জাগরিত হও এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সমীপস্থ হইয়া সম্যক্‌জ্ঞান লাভ কর। বিবেকী পুরুষগণ বলেন, সেই আত্মজ্ঞানের পথ কঠোর সাধন সহ সাবধানে অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া উহা ক্ষুরের তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগের ধারের ন্যায় অতীব দুর্গম।"

সাধক! সাময়িক দুঃখে বা অকৃতকার্য্যতায় নৈরাশ্যের করাল কবলে পতিত হইয়া নিজেকে বিষয়স্রোতে ভাসাইয়া দিও না। এ পথ ধরিয়া থাক, প্রবল ইন্দ্রিয়বর্গকে স্ববশে রাখিবার জন্য দৃঢ়পরিকর হও। এ যুদ্ধে প্রথমতঃ তোমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু হাল ছাড়িয়া না দিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলে পরিশেষে জয়মাল্য তোমার কণ্ঠদেশের শোভা বিস্তার করিবেই—এটি এ রাজ্যের চিরন্তন নিয়ম। তখন দেখিবে, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান; তোমার ইচ্ছা মুহূর্ত্তেই পূর্ণ হইতেছে—তুমি যেন এক নূতন লোকে বিরাজ করিতেছ, তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টি হইতে পারে, আবার তোমার ইচ্ছায় লয়ও হইতে পারে।

ভোলানন্দও এবম্প্রকার অবস্থা লাভ করিয়া সকলের সহিত বালকবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই তাঁহার অলৌকিকতা দেখিবার অবকাশ পান নাই। কৈলাস-দাস নামে একজন বাঙ্গালী শিষ্যের সহিত ভোলানন্দ কতিপয় দিবস দিল্লীতে হাইকোর্টের উকীল পণ্ডিত শ্যামলালের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। কৈলাসের

পা একটু ফুলিয়াছে, তাই ভোলানন্দ তাঁহাকে বলিলেন—"কৈলাস! চল্ একটি গাড়ী করে বেড়িয়ে আসি, তোর পা-টা ফুলেছে, হেঁটে যেতে তোর কষ্ট হবে।" ভোলানন্দ ও কৈলাস উভয়ে ধীরে ধীরে হাঁটিতে লাগিলেন। রাস্তায় কোন গাড়ী না পাওয়ায় অগত্যা উভয়কেই পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হইল। ভোলানন্দ বলিলেন—'আচ্ছা ফিরিবার সময় গাড়ীতে আসিব।' শ্যামলালের গৃহ হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত শ্মশান-ঘাটে যাইয়া উভয়ে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় 'রাম-নাম সত্য হ্যায়' বলিতে বলিতে কতিপয় ব্যক্তি একটি মৃতদেহ কাঁধে করিয়া শ্মশানে উপনীত হইল। শববাহকদিগের পশ্চাতে মৃতব্যক্তির পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছিল। শব শ্মশানে আনীত হইল এবং দগ্ধ করিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ভোলানন্দ কৈলাসকে বলিলেন—"কৈলাস! দেখবি, ও বাস্তবিক মরে নাই, এখনই বেঁচে উঠ্‌বে" এই বলিয়া ভোলানন্দ মৃতদেহটির নিকট উপস্থিত হইলেন। মৃতব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবন লাভ করিল। ভোলানন্দ তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—"আমার নাম 'রামখেলম্'।" পুত্রকে পুনর্জীবিত দেখিয়া পিতা আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে লইতে উদ্যত হইল। ভোলানন্দ তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন—"তোমরা ত একে মৃত ভেবে পরিত্যাগ করেছিলে, আমি এখন একে জীবিত করেছি, সুতরাং এ ছেলে আমার।"

পিতা ভোলানন্দের এবম্প্রকার বাক্যে পুত্র-লাভে হতাশ হইয়া পুনরায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল ও ভোলানন্দের নিকট পুত্র প্রার্থনা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শ্মশানঘাট লোকে লোকারণ্য হইল। সার্কেল ইন্‌স্পেক্টরও সেখানে উপস্থিত হইল। ভোলানন্দ কৌতুকচ্ছলে তাহাকে বলিলেন—"তুমিই এর বিচার কর, ছেলেটি আমার প্রাপ্য অথবা ওর পিতার প্রাপ্য ?" ভোলানন্দের বালক-ভাব ও অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর ও সমাগত দর্শকবৃন্দ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। সহরে এ সংবাদ বিস্তৃতি লাভ করিল। মৃত ব্যক্তিকে এক সাধু জীবন দান করিয়াছেন শুনিয়া ইউ-রোপীয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটও সাধুর দর্শন মানসে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর ভোলানন্দের নিকট ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিচয় দিল। ভোলানন্দ সহাস্যবদনে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে বলিলেন—"আচ্ছা, আপনারা ত বিচারক, আপনি বিচার করুন—এ ছেলে আমার হওয়া উচিত কিংবা উহার পিতার ?" ম্যাজিষ্ট্রেট সহাস্যবদনে বলিলেন—"আপনার"। ম্যাজিষ্ট্রেট, কৈলাস ও মৃতব্যক্তির পিতার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের গাড়ীতে মৃতব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইয়া ভোলানন্দ ছেলেকে তাহার মাতার হস্তে অর্পণ করিলেন। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ভোলানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এখানে কোথায় থাকেন ?"

ভোলানন্দ বলিলেন—"হাইকোর্টের উকীল পণ্ডিত শ্যামলালের বাড়ীতে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সোৎসাহে বলিলেন—"ও, শ্যামলাল, সে যে আমার একজন বিশেষ বন্ধু, চলুন আপনাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।" এই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট, ভোলানন্দ ও কৈলাসের সহিত শ্যামলালের গৃহে উপনীত হইয়া ভোলানন্দকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভোলানন্দ কৈলাসকে বলিলেন—"দেখ্ বলেছিলেম গাড়ীতে আস্‌ব, তা ম্যাজিষ্ট্রেটের গাড়ীতেই আসলাম, অথচ এক পয়সাও লাগল না।" ভোলানন্দের বালকের ন্যায় কথা শুনিয়া কৈলাস হাসিতে লাগিলেন।

[৩]

মুমূর্ষু-রক্ষক ভোলানন্দ

ক্ষীণকণ্ঠে খোকা ডাকিল—"মা"! স্নেহব্যঞ্জকস্বরে অমরের স্ত্রী বলিলেন—"কি বাবা।" খোকা বলিল—"আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি।" আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া অমরের স্ত্রী উঠিয়া খোকার শরীরে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক সোৎসাহে বলিলেন—"সে কি বাবা!" খোকা বলিল—"না, মা! স্বামীজি এসেছিলেন, আমার আর কোন কষ্ট নাই।" খোকার কথা শুনিয়া অমর প্রভৃতিও খোকার কাছে আসিয়া সোৎসাহে তাহার শরীরে হাত দিয়া দেখিলেন, বস্তুতঃই কোন প্রকার ব্যাধির লক্ষণ নাই। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহারা

খোকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে, কি হয়েছে বল্ না, স্বামীজিকে কি ভাবে দেখ্‌লি ?" খোকা বলিল—"খুব উজ্জ্বল মূর্ত্তি, মাথায় পাগ্‌ড়ী, পায়ে খড়ম ও হাতে কমণ্ডলু, পিছনে একদল সন্ন্যাসী। স্বামীজি তাঁহার হস্তস্থিত কমণ্ডলু হইতে আমার সর্ব্বশরীরে জল ছিটাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল।"

অবিনাশী শরীরী বা দেহী এক—তিনিই বিভিন্ন দেহে বিরাজ করিতেছেন, দেহনাশে তাঁহার নাশ হয় না। এই দেহী বা চৈতন্য আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী এবং তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া শাশ্বত পদ লাভ করা যায়। কিন্তু দুর্ব্বিজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিবার উপায় কি ? একমাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই এই আত্মতত্ত্ব লাভ করা সম্ভব হয়। শ্মশানভূমিতে মানবদেহ ভস্মে পরিণত হইতেছে—এ দৃশ্য অনেকের দৃষ্টিপথেই নিপতিত হইয়া থাকিবে। কল্পনা-দ্বারা নিজের শরীরটিকে শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান কর। শরীর কাল্পনিক ভস্মে পরিণত হইলে নামরূপ অতীত যে বস্তুর উপলব্ধি হয়, তিনিই আত্মা—সেই আত্মা ও তুমি এক। শ্মশানভূমিতে শৃগাল, কুকুর, শকুনী প্রভৃতি দ্বারা অসংখ্য মৃতদেহ খণ্ডবিখণ্ড হইতেছে, কল্পনার সাহায্যে নিজের শরীরটিকে উক্ত স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক কুকুর শৃগাল দ্বারা শরীরটি ভক্ষিত হইতেছে,—অস্থি, মাংস

প্রভৃতির জন্য কুকুর, গৃধিনী প্রভৃতি পরস্পর কলহ করিতেছে —সেই ভয়াবহ দৃশ্য মানস-পথে উদিত কর। শরীরটি এই প্রকারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে নামরূপাতীত আনন্দস্বরূপ যে বস্তুর উপলব্ধি হয়—সেই বস্তুই আত্মা বা ব্রহ্ম। সেই আত্মা ও তুমি অভেদ। চিকিৎসা-বিদ্যালয় বা যাদুঘরে মানবের কঙ্কাল দৃষ্ট হইয়া থাকে, কল্পনা দ্বারা নিজের শরীরটিকে সেই কঙ্কালের পার্শ্বে স্থাপন করিয়া ইহাকেও কঙ্কালরূপে চিন্তা কর। শরীরটি কল্পনাক্ষেত্রে কঙ্কালে পরিণত হইলে, কঙ্কালে বা নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে যে নামরূপাতীত বস্তুর উপলব্ধি হয়, তিনিই 'নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বণ্ ন কারয়ন' ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই আত্মা বা চৈতন্য—সেই চৈতন্যই তুমি। এই প্রকার ধীরে ধীরে বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা মনকে আত্মাভিমুখী করিতে পারিলেই অশান্ত মন শান্তিদেবীর ক্রোড়ে চির-বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে। তখন তুমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান হইয়া শিবরূপে এই জগতেই বিরাজ করিতে সমর্থ হইবে।

সে বৎসর জিলা সিলেট সুনামগঞ্জনিবাসী রায়-বাহাদুর অমরনাথ রায় এম্, এল্, সি মহাশয়ের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ডাক্তার ও কবিরাজগণ দ্বারা সুচিকিৎসিত হওয়া সত্ত্বেও যখন তাহার রোগের উপশম হইল না—যখন বৈদ্যগণ তাহার জীবনের প্রতি হতাশ হইলেন, অনন্যোপায় হইয়া অমর তখন

ভোলানন্দকে হরিদ্বারে টেলিগ্রাফ করিলেন। টেলিগ্রাফের উত্তরে ভোলানন্দ লিখিলেন—'যথাশক্তি নাম ও দান কর।' কতিপয় দিবস পরে ভোলানন্দের নিকট তাঁহার অসীম কৃপায় পুত্রের আরোগ্যের বিষয় বিবৃত করিয়া অমর পত্র দিলেন। লেখক পত্র পড়িতেছিল। ভোলানন্দ লেখককে বলিলেন,—"দেখ্, তোরা ত বিশ্বাস করিস্ না যে, চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী, এই দেখ্ আমি ত এখানেই তোদের কাছে রয়েছি,আমি ত আর সুনামগঞ্জে যাই নাই, কিন্তু চৈতন্য সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, তিনি সেখানে বসেই কাজ করেছেন। এই চৈতন্যকে সাধন-বলে জ্ঞাত হ', তা'হলেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান হ'তে পার্বি।"

[৪]

ভক্তিতে আপ্লুত ভোলানন্দ

বিপিন গাহিতেছেন—

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া॥
নয়ন থাকৃতে দেখ্‌লে না মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া॥
মা ভক্তেরে ছলিতে তনয়া রূপেতে।
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।
মায়ে কত ভালবাসে, বোঝা যাবে মৃত্যুশেষে।
করে দণ্ড দু'চার কান্নাকাটি শেষে দিবে গোবর-ছড়া॥

ভাই বন্ধু দারা সুত কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মলে সঙ্গে দিবে মেটে কল্‌সী, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চার-কোণা মাঝখানে ফাড়া॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পায় কালিকা তারা।
বেড় হয়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছেন বেড়া॥

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কভু, দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম-সামর্থ্যে ডুব দিয়ে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কোলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই ফিরে।
তুই বিবেক-হলুদ গায়ে মেখে যা, ছোবে না তার গন্ধ পেলে॥

অবিরল ধারায় কপোল বহিয়া ভোলানন্দের অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল। সুন্দর মুখমণ্ডল সুন্দরতম হইল। কণ্ঠস্থিত নামাবলী দ্বারা ভোলানন্দ মুহুর্মুহুঃ অশ্রুবারি মুছিতে লাগিলেন।

তথাকথিত ভক্ত ও জ্ঞানীর মধ্যে মতভেদ চিরবর্ত্তমান। ভক্ত ভক্তিকে উচ্চাসন দিতেছেন, অপরপক্ষে জ্ঞানী জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত ও জ্ঞানীর মধ্যে বিন্দুমাত্রও মতভেদ থাকিতে পারে না। তাঁহারা জানেন, জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি হয় না, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান হয় না। তত্ত্বজ্ঞান, বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ যেপ্রকার পরস্পর-সম্বন্ধ—তত্ত্বজ্ঞান না হইলে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ হইতে পারে না, মনোনাশ

না হইলে বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না, বাসনাক্ষয় না হইলে মনোনাশ ও তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না—তদ্রূপ ভক্তি ও জ্ঞানও পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। একটির অভাবে অন্যটির স্ফুরণ, বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং একটির স্ফুরণে অন্যটির স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমভেদে ভক্তি তিন প্রকার,—যথা নবধা, প্রেমা ও পরা। সাধনরাজ্যে উন্নতিকামী ব্যক্তির পক্ষে প্রথমতঃ নবধাভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নবধাভক্তি, যথা ঃ—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥"

একাগ্রমনে ভগবানের গুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন প্রভৃতি দ্বারা মন ধীরে ধীরে তাঁহার চরণে নিবিষ্ট হইলে বিষয়বাসনা হইতে মন মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম ও রূপ-রসে মত্ত হয়। তখন সাধক প্রেমাভক্তি লাভ করেন। প্রেমাভক্তি লাভ হইলে মন সর্ব্বদা ভগবানের নাম শুনিতে ব্যাকুল হয়, ভগবানের কথা ব্যতীত অন্য কিছুই তখন ভাল লাগে না। ভগবানের নাম শুনিতেই অবিরল ধারায় সাধকের নয়ন হইতে অশ্রুবারি বহির্গত হইতে থাকে; অহরহঃ স্বেদ, পুলক, কম্পন ও মূর্চ্ছা হইতে থাকে। কখনও পাগলের মত হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও মৌনধারণ করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকেন, আবার কখনও উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করেন ও নাচেন। কখনও নিজকেই ইষ্টবোধে

ভাবনা করেন। বিষয়-বাসনার লেশমাত্রও তখন তাঁহার মনে আসিতে পারে না, কারণ তখন তাঁহার মন সত্ত্বগুণে স্থিত ; সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি—তাঁহার মন দুঃখবর্জ্জিত। প্রেমাভক্তির গুণে অন্তঃকরণ যখন স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ হয়, তখন সাধকের আত্মদর্শন হয়, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মভূত বা জ্ঞানিপদবাচ্য হন। ব্রহ্মভূত অবস্থা লাভান্তর সাধক পরাভক্তি লাভ করেন। যথা ঃ—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥"

অর্থাৎ—"ব্রহ্মভূত সুতরাং প্রসন্নাত্মা যতি শোকও করেন না এবং কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিযুক্ত হইয়া পরমা মদ্‌ভক্তিকে (পরাভক্তিকে) লাভ করিয়া থাকেন।" পরাভক্তি লাভান্তর সাধক সব সময়ই ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, ভগবান হইতে ক্ষণিকের জন্যও বিচ্ছিন্ন হন না। তৎপর সাধক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন বা জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হন। যথা ঃ—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

অর্থাৎ—"আমি কি পরিমাণ ও কে, তাহা ভক্তিদ্বারা যথার্থরূপে জানিতে পারেন ও তাহার পর আমার যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।"

শুভেচ্ছা, সুবিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবিনী ও তুরীয়ভেদে জ্ঞানের সপ্তভূমিকা কথিত

হইয়াছে। বিষয়ে বিদ্বেষ ও গুরু তীর্থ প্রভৃতিতে অনুরাগের নাম শুভেচ্ছা। একান্তে বসিয়া 'আমি কে, সংসার কি' এই প্রকার তত্ত্ব চিন্তা করার নাম সুবিচারণা। মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহারপূর্ব্বক স্বরূপে নিবদ্ধ রাখার নাম তনুমানসা। তনুমানসার অবস্থা যখন গাঢ়তম হয়, যখন সাধক প্রগাঢ় আত্মধ্যানে মগ্ন থাকেন, তখন তাঁহার কাছে জগৎ সিন্ধুমধ্যে তরঙ্গবৎ স্বতঃই মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়; এই অবস্থাই সত্ত্বাপত্তি নামে খ্যাত। সত্ত্বাপত্তি অবস্থালাভ বা চতুর্থ ভূমিকায় উপনীত হইলেই সাধক ব্রহ্মভূত হন; তাঁহার কাছে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়। তখন তিনি পরাভক্তি লাভ করেন। পরাভক্তি লাভ হইলে ক্রমশঃ তিনি পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিকায় উপনীত হইয়া নির্ব্বিশেষভাবে ব্রহ্মকে অবগত হন। পঞ্চম ভূমিকা বা অসংসক্তি অবস্থায় সাধক নিজেকে দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া মনে করেন, নিজের দেহকে অপরের দেহ বলিয়া ধারণা হয়। ষষ্ঠ ভূমিকা বা পদার্থাভাবিনী অবস্থায় সাধকের নিকট দেহ বা জগৎ নামে কোন বস্তুরই প্রতীতি হয় না; তখন সকল পদার্থেরই অভাব অনুভূত হয়। সপ্তম ভূমিকা বা তুরীয় অবস্থায় সাধকের নিকট কোন বস্তুরই ভাব বা অভাব অনুভূত হয় না, কারণ তখন তাঁহার আমিত্ব নষ্ট হইয়া যায়—'অবাঙ্‌মনসগোচরম্' সেই ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। চতুর্থ ভূমিকায় উপনীত সাধক ব্রহ্মবিৎ বলিয়া কথিত

হন; পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভূমিকায় ব্রহ্মবিৎ বরীয়ান্ ও সপ্তম ভূমিকায় ব্রহ্মবিৎ বরিষ্ঠ।

নবধা ভক্তির পর প্রেমাভক্তি, প্রেমাভক্তির পর জ্ঞান বা আত্মদর্শন, জ্ঞানের পর পরাভক্তি এবং পরাভক্তির পর নির্ব্বাণ (জ্ঞানের শেষ পরিণতি) লাভ হইয়া থাকে। ভক্তি ও জ্ঞান এই প্রকার পরস্পর-সম্বদ্ধ।

সেদিন স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ গিরিজী ও স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরিজীর সমভিব্যাহারে লেখক সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রয়োজনবশতঃ লেখক ভ্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া একাই আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আশ্রমে উঠিয়াই লেখক যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আনন্দের আর অবধি রহিল না। বিপিনবিহারী ঘোষ নামে একজন বৃদ্ধ শ্যামা-ভক্ত রামপ্রসাদী সঙ্গীত গাহিতেছেন। ভোলানন্দ কেদারায় উপবিষ্ট, বিপিন তাঁহারই নিম্নে বেঞ্চের উপর বসিয়া। ভোলানন্দ একাগ্রমনে গান শুনিতেছেন—নয়ন হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু নির্গত হইতেছে, মুখে অপূর্ব্বভাব ও জ্যোতি খেলিতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া লেখক আনন্দে আত্মহারা হইল, আবার পরক্ষণেই বিস্ময়ে অবাক্ হইল—"এ কি, জ্ঞানী ভোলানন্দের এ কি প্রকার দ্বৈতভাব? কার জন্য তিনি নয়ন-বারি বিসর্জ্জন করিতেছেন, ব্রহ্ম ত 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'—তবে এ দ্বৈতভাব কোথা হইতে আসিল!"

গুরু-কৃপায় লেখকের ভ্রান্তি শীঘ্রই অপনোদিত হইল; সে বুঝিল—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥"

অর্থাৎ—হে ভরত-কুল-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! পীড়িত, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, ধনার্থী ও জ্ঞানী, এই চারিপ্রকার পুণ্যাত্মা ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন। সেই চারি প্রকার মৎ-সেবকগণের মধ্যে নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি (একমাত্র ভগবানে ভক্তি-বিশিষ্ট) জ্ঞানীই প্রধান। জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার প্রিয়। ইহারা সকলেই উৎকৃষ্ট; কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মাই, ইহাই আমার মত, কারণ, সেই সমাহিতমনা জ্ঞানী আমাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করেন।

[৫]

আধ্যাত্মিক তাপনিবারক ভোলানন্দ

হঠাৎ গভীর রাত্রে ভোলানন্দের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথ সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্র, গুরুকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। গুরু একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে বিরাজমান। কিন্তু গুরু শব্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মানব বিচারহীন হইয়া রামা, শ্যামা, যদু, মধু প্রভৃতিকে গুরুপদে বরণ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেছে না। গুরুবংশপরম্পরা শিষ্য-বংশপরম্পরাকে দীক্ষা প্রদান করিতেছেন—ইহা যেন তাঁহাদের জন্মগত অধিকার। শিষ্য-বংশপরম্পরাও কুলগুরু পরিত্যাগ করা মহাপাপ—এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহাদের নিকটে পরমতত্ত্ব লাভ করিবার প্রয়াস করিতেছে। গুরু স্বভাব-দোষে দুষ্ট, আধ্যাত্মিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, জ্ঞাত হইয়াও তাহারা তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতেছে। অন্ধ গুরু অন্ধ শিষ্যকে পথ প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়া উভয়েই মোহ-কূপে নিমজ্জিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। শিষ্যের সন্তাপ হরণে সম্পূর্ণ অসমর্থ গুরু, শিষ্যের বিত্তাপহরণের জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টিত ও লালায়িত। সদ্‌গুরুর আশ্রয় ব্যতীত জীবনে শান্তিলাভ অলীক কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে হইলে, তত্ত্বজ্ঞানে মনকে বিভূষিত করিতে হইলে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা থাকিলে তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। শ্রীভগবানও জীবকে গুরুতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য

এবং জ্ঞান লাভের সহজ, সরল ও একমাত্র পন্থা প্রদর্শন করিবার মানসে বলিতেছেন :—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেব যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥"

তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সেবাদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে তাঁহার উপদেশে অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই গুরুশব্দ-বাচ্য, তাঁহার কৃপায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ও অচিরে দূরীভূত হয়।

সে বৎসর সিলেট জিলায় বসন্তের প্রকোপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বহু লোক উক্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ডাকঘরের কেরাণী গোপীনাথ দাস জ্বর সহ জলবসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি একাগ্রমনে গুরুদেব ভোলানন্দকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ ভোলানন্দের দর্শন লাভ করিতেই তাঁহার সকল যন্ত্রণার উপশম হইল। গুরু-কৃপায় আধ্যাত্মিক তাপ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আনন্দবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[১]

অহৈতুক কৃপাসিন্ধু ভোলানন্দ

রাত্রি তখন একটা বাজিয়াছে; হঠাৎ 'হর হর বম্ বম্' শব্দে পার্ব্বতীচরণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, নিকটে জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি তিনজন সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। "প্রসাদ লেও" বলিয়া ভোলানন্দ পার্ব্বতীচরণের হস্তে একটি লাড্ডু প্রদান করিলেন। অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত তাহা ভক্ষণ করিয়া পার্ব্বতীচরণ জলের জন্য নিকটবর্ত্তী একটি কলের নিকটে গমন করিতেই সাধুগণ অন্তর্হিত হইলেন।

সে বৎসর বরিশাল ভারুকাঠীগ্রাম-নিবাসী কবিরাজ শ্রীমান্ পার্ব্বতীচরণ দাশগুপ্ত মহাশয় মায়ের প্রসন্নতা লাভ করিবার মানসে কলিকাতা কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের পাণ্ডারা তাঁহাকে মায়ের মন্দিরে থাকিতে দিতে অসম্মত হওয়ায় তিনি অগত্যা নকুলেশ্বরের মন্দিরে শুধু গঙ্গাজল পান করিয়া ৭ দিন অতিবাহিত করিলেন। শেষের দিন নিশীথ সময়ে যখন তিনি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখন হঠাৎ 'হর হর বম্ বম্' শব্দ করিতে করিতে ভোলানন্দ অপর দুই জন সাধুর সহিত

সেখানে উপস্থিত হইয়া পার্ব্বতীকে কৃপা করিলেন। মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়া পার্ব্বতীচরণ ধন্য হইলেন। * তাঁহার জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। পরিশেষে তিনি ভোলানন্দকে গুরুপদে বরণ করিয়া নিজকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন।

[২]

অসঙ্গ ভোলানন্দ

"আপনি আমার জীবনরক্ষক" বলিয়া দুর্গানাথ ভোলানন্দকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ভোলানন্দ বলিলেন —"আমি কিছুই করি না, সব ভগবান করেন।"

বরিশালের তদানীন্তন এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সম্পর্কীয় ভ্রাতা (cousin brother) এবং ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অনন্যকর্ম্মী শ্রীমান্ দুর্গানাথ ঘোষ সে বৎসর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া চলচ্ছক্তি রহিত হন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার ৺রূপবাবুর বাড়ীতে একজন সাধু আসিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপায় তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইয়াছেন। পরদিন শুনিতে পাইলেন, বস্তুতঃই ৺রূপবাবুর বাড়ীতে ভোলানন্দ আসিয়াছেন। দুর্গানাথ ভোলানন্দের নিকট

* এই তিন জন সন্ন্যাসীর মধ্যে হরিদ্বার ভীমগোডা-নিবাসী স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি মহারাজও ছিলেন।

হইতে একটু প্রসাদ আনিবার জন্য আশ্রমস্থ সেবকগণকে অনুরোধ করিলেন। ভোলানন্দ প্রসাদ না পাঠাইয়া নিজেই আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সেখানে কিছু ফল ও অর্থ দান করিয়া দুর্গানাথের নিকটে যাইয়া বলিলেন—"বোল হামারা বেমারী ছুট্‌ গিয়া।" ভোলানন্দের আজ্ঞানুযায়ী দুর্গানাথ উক্ত প্রকারে তিন বার বলিতেই সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন। তারপর অনেক বৎসরান্তে ভোলানন্দ ষ্টীমারযোগে বরিশাল হইতে মাদারীপুরে যাইতেছিলেন। দুর্গানাথ তখন বরিশালে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ভোলানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ষ্টীমারে উপনীত হইয়া তাঁহাকে নিজের জীবনরক্ষক বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ভোলানন্দ আবেগভরে বলিতে লাগিলেন— "আমি তোমার মধ্যে কল্যাণানন্দকে দেখিতে পাইতেছি।" *

[৩]

আর্ত্তরক্ষক ভোলানন্দ

'জল পি লেও' বলিয়াই ভোলানন্দ মৃত্যুশয্যায় শায়িত নগেনকে নিজের কমণ্ডলু হইতে জলপান করাইয়াই অন্তর্হিত হইলেন। নগেন তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া

* ইনি হরিদ্বার-কন্‌খল রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী।

ভোলানন্দকে স্মরণ করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সে বৎসর বর্ত্তমান বরিশাল হিন্দু-মহাসভার সম্পাদক কবিরাজ শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে হরিদ্বার আশ্রমে রাখিয়া ভোলানন্দ বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কিছুদিন পর হঠাৎ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সুচিকিৎসিত হইবার মানসে নগেন কন্‌খল রামকৃষ্ণমিশন-সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন; গাড়ী হইতে তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় অবতরণ করান হইল। চৈতন্য লাভপূর্ব্বক গুরুদেব ভোলানন্দের বিনানুমতিতে আশ্রম পরিত্যাগ করিবার জন্য নগেনের অনুতাপ হইতে লাগিল। কিন্তু তখন আশ্রমে পুনরাবর্ত্তন করিতে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম। একদিন তাঁহার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িল। মিশনের সেবকবৃন্দ কলিকাতায় তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট টেলিগ্রাফ করিলেন। তৎপরদিন নগেনের অবস্থা এতদূর খারাপ হইল যে, তিনিও মৃত্যু অনিবার্য্য জ্ঞাত হইয়া একাগ্রমনে ইষ্টদেব ভোলানন্দকে স্মরণ ও ভোলানন্দ-প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। আর্ত্ত ভক্ত নগেনের স্মরণে ভোলানন্দ হঠাৎ গভীর রাত্রে নগেনের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া নিজের কমণ্ডলু হইতে তাঁহাকে জলপান করাইলেন। নগেন মনে করিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই পেটের মধ্যে জল যাওয়ার শব্দ পাইয়া তাঁহার সে ভ্রান্তির অপনোদন

হইল। হঠাৎ তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই তাঁহার সকল প্রকার ব্যাধির ও ক্লান্তির অবসান হইল। ভোলানন্দকে স্মরণ করিতে করিতে আনন্দিত মনে নগেন রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। পরদিন প্রভাতে মিশনের সেবকগণ নগেনের এবম্প্রকার অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। সেইদিনই টেলিগ্রাফ প্রাপ্ত হইয়া নগেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম, এ, মিশনে উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে ভোলানন্দের অশেষ কৃপার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উভয় ভ্রাতা তখন আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

[৪]

ভক্তবৎসল ভোলানন্দ

হঠাৎ রাত্রি বারোটার সময় ভোলানন্দের শ্রীমুখ স্মৃতিপথে উদিত হইতেই পার্ব্বতীচরণের সকল যন্ত্রণার উপশম হইল; তিনি শরীরে হাত দিয়া দেখিলেন, সমস্ত গুটিগুলিই লুপ্ত হইয়াছে। প্রভাত হইবামাত্রই তিনি হরিদ্বারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

১৩৩৩ সনের হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দর্শনেচ্ছু হইয়া পার্ব্বতী-চরণ সাংসারিক বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার

ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট লক্ষ্মীপুরে (নোয়াখালী) গমন করেন। সেখানে তিনি জ্বরসহ জলবসন্তদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। হরিদ্বারে যাইবার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া তাঁহার অত্যন্ত মনস্তাপ হইতে লাগিল। মুখে এবং বুকে অসংখ্য বড় বড় গুটি উঠায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। একদিন রাত্রি আটটার সময় তিনি ভোলানন্দের নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর! হরিদ্বারে যাইতে অক্ষম হওয়ায় আমার যে মনস্তাপ হইয়াছে, তাহা যেন সহ্য করিতে পারি।" সেই রাত্রিতেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন এবং শেষ কুম্ভস্নানের পূর্ব্বে হরিদ্বারে উপনীত হইয়া সুদীর্ঘ তিন মাস কাল ভোলানন্দের সেবায় অতিবাহিত করিলেন।

[৫]

ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভোলানন্দ

হঠাৎ সোমেশের মৃতা স্ত্রী আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। ভোলানন্দ সোমেশকে স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া উভয়কে দীক্ষা প্রদান করিতেই স্ত্রী অন্তর্হিতা হইলেন।

প্রসিদ্ধ গণিততত্ত্ববিৎ শ্রীমান্ সোমেশচন্দ্র বসুর স্ত্রী অদীক্ষিত অবস্থায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। স্ত্রীর

প্রতি আসক্ত-চিত্ত সোমেশ প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন না। স্ত্রী অদীক্ষিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, স্মরণ করিয়া সোমেশ মৃতা স্ত্রীর সহিত একত্রে দীক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ এমন গুরুর অন্বেষণে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও মনোমত গুরু লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৩২৬ সন ১৪ই বৈশাখ, হরিদ্বারে ভোলানন্দের নিকট উপনীত হইয়া স্বীয় মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। ভোলানন্দ বলিলেন—"আচ্ছা হো জায়গা, ঘাবড়াও মৎ"* ভোলানন্দের আদেশানুযায়ী দীক্ষাগৃহে তিনটি আসন স্থাপিত হইল। ভোলানন্দের সহিত সোমেশ দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। পরক্ষণেই সোমেশের মৃতা স্ত্রী আসিয়া তৃতীয় আসনটিতে উপবিষ্ট হইলেন। বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে সোমেশ স্ত্রীর প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীই বটে। সোমেশ ভোলানন্দকে ভগবানের সচল বিগ্রহজ্ঞানে ভক্তিতে আপ্লুত হইলেন; তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল; কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন-ভজনে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন।

* আচ্ছা, হয়ে যাবে, অস্থির হইও না

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[১]

দিব্যজ্যোতির্ম্ময় ভোলানন্দ

হঠাৎ ভোলানন্দের দেহ হইতে দিব্য জ্যোতি নির্গত হইয়া গৃহটিকে বিদ্যুতালোকে আলোকিত করিল—তাহা দেখিয়া শশিকান্তের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। বলা বাহুল্য, সে সময় ঘরে একটিমাত্র প্রদীপ মিট্‌-মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল।

ভোলানন্দ সে বৎসর কলিকাতায় ২১১ নং হ্যারিসন রোডে অবস্থান করিতেছিলেন। দীক্ষাগ্রহণ মানসে বরিশালের উকীল শ্রীমান্ শশিকান্ত গুপ্ত এম, এ, বি, এল, ভোলানন্দের নিকট উপস্থিত হন। দীক্ষাপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বদিন আরতি স্তোত্রাদি পাঠান্তে ভোলানন্দ সমাগত সকলকে মধুর উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেদিন জনৈক মাড়ওয়ারী ভদ্রলোকের গৃহ হইতে প্রচুর আহার্য্য জিনিষ আসিয়াছিল। সকলেই ছাদে বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। সকলকে শশিকান্তের জন্য কিছু প্রসাদ রাখিতে বলিয়া ভোলানন্দ তাঁহাকে নিজের কাছে বসিতে আদেশ করিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় সমাগত ভক্তবৃন্দ বিদায়

গ্রহণ করিলেন। ভোলানন্দ ও শশিকান্ত এক ঘরেই উপবিষ্ট রহিলেন। ভোলানন্দ রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত শশিকান্তকে উপদেশ প্রদান করিলেন, পশ্চাৎ তাহাকে মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; তাঁহার চক্ষুঃ হইতে বিগলিত ধারায় স্নেহাশ্রুবারি বহির্গত হইতে লাগিল। শশিকান্ত তখন আনন্দের আতিশয্যে নিজেকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। এত স্নেহ, এত আদর, এত গৌরব তিনি জীবনে কখনও অনুভব করেন নাই। ঐ সময় হঠাৎ গৃহটিকে বিদ্যুতালোকে আলোকিত দেখিয়া শশিকান্ত স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। পশ্চাৎ বুঝিতে পারিলেন, তাহার কঠিন হৃদয়কে একটু নরম করিবার জন্যই এবম্প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

[২]

নবীন সাধকহৃদয়ে আশা-সঞ্চারকারী ভোলানন্দ

ভোলানন্দের রূপধ্যানে ও তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত মন্ত্রজপে নিমগ্ন দ্বিজেন্দ্র স্বীয় ললাটে 'চন্দ্রকোটিসুশীতলম্' দিব্যজ্যোতি দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন।

আসাম তেজপুর বনবিভাগের ই, এ, সি. শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্র-নাথ দে হরিদ্বারে ভোলানন্দের নিকট হইতে দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মস্থল তেজপুরে গমন করিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও

বিশ্বাসের সহিত অসীম উদ্যমে সাধন-ভজনে রত হইলেন। ভোলানন্দের উপদেশানুযায়ী গুরুমূর্ত্তি ধ্যান ও প্রাণায়ামসহ নাম জপ করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস সাধন করিতেই হঠাৎ দিব্যদর্শন লাভ করিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি অধিকতর কঠোর সাধনে ব্যাপৃত হইলেন। জপ ও প্রাণায়ামের সংখ্যা গুরুনির্দ্ধারিত সংখ্যাকেও অতিক্রম করিল। অত্যধিক প্রাণায়ামে তিনি মাথায় যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। স্বীয় অবস্থা বিবৃত করিয়া তিনি হরিদ্বারে ভোলানন্দকে পত্র দিলেন। ভোলানন্দ তদুত্তরে লিখিলেন :—

"প্রাণায়াম সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়া শুধু ইষ্টমন্ত্র জপ কর। অত্যধিক কিছুই ভাল নয়, সাধনও নিয়মিত ভাবে করিতে হয়।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

পরিমিত আহার-বিহারশীল, কর্ম্মে নিয়মিত চেষ্টাবান ও নিয়মিত নিদ্রাজাগরণশীলের যোগ দুঃখ হরণ করিতে সক্ষম হয়। মাথার উপর মাখন রাখ ও মিশ্রী, মাখন, বাদাম প্রভৃতি পুষ্টিকর সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার কর। মস্তিষ্কের যন্ত্রণার সম্পূর্ণরূপে উপশম হইলে পুনরায় প্রাণায়াম আরম্ভ করিও, কিন্তু তখনও প্রত্যেক তিনমালার পর অর্দ্ধঘণ্টা

বিশ্রাম করিও, এই ভাবে নয় মালা জপ করিতে একঘণ্টা বিশ্রাম করিও ; নতুবা পুনরায় এবম্প্রকার যন্ত্রণা হইতে পারে।”

[৩]

ভক্তের মানরক্ষক ভোলানন্দ

বিশেষ গভীর ভাবে ভোলানন্দের ধ্যান করিতে করিতে সোমেশ সেই জেল-কক্ষেই ভোলানন্দকে দেখিতে পাইলেন —তাঁহার নাসিকার উভয় পার্শ্বে ৬ ও ৫ এই দুইটি অক্ষর দৃষ্টিগোচর হইল। ভোলানন্দের অন্তর্ধানের পরক্ষণেই সোমেশ উপস্থিত সাহেবটিকে বলিলেন—“তোমার বয়স ৬৫ বৎসর”।

তখন ১৯২২ খৃষ্টাব্দ। গণিতজ্ঞ শ্রীমান্ সোমেশচন্দ্র বসু অর্থোপার্জ্জন মানসে সুদূর আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে শুধু দুগ্ধ পান করিয়া তিনি দিন যাপন করিতেন, কদাচিৎ সামান্য ফল গ্রহণ করিতেন এবং প্রত্যেক মাসে কয়েকদিন উপবাসে অতিবাহিত করিতেন। এই প্রকার যৎসামান্য খাদ্য গ্রহণ পূর্ব্বক কি ভাবে শরীর সম্পূর্ণ নিরাময় রাখে ও বড় বড় অঙ্ক মুখে মুখে কষিয়া থাকে এবং কেনই বা এ প্রকার সামান্য আহার করে—এই প্রশ্নের সমাধান করিতে অক্ষম হইয়া কানাডা গভর্ণমেণ্ট সন্দেহে তাঁহাকে কানাডার জেলে দেড়মাস আবদ্ধ রাখিয়াছিল ;

অবশেষে 'অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে না' এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে জেল হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। জেলে আবদ্ধ থাকার সময় একদিন একজন গার্ড তাহার (গার্ডের) বয়স বলিবার জন্য সোমেশকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল। সোমেশ বলিলেন—"অপরের বয়স আমি কি প্রকারে বলিব।" কিন্তু গার্ডের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করিলেই বয়স বলিতে পারেন। এক ঘণ্টা অনুরোধের পরও যখন সোমেশ বয়স বলিতে রাজী হইলেন না, তখন সে একখানা চেয়ার লইয়া সোমেশের নিকট উপবেশন করিয়া বলিল—"আপনি আমার বয়স না বলা পর্য্যন্ত আমি এখান হইতে উঠিব না, আহারাদিও করিব না।" সোমেশ মহামুস্কিলে পড়িলেন। গুরুদেব ভোলানন্দকে স্মরণ করিয়া বলিলেন—"গুরুদেব! বিদেশে এসেছিলেম অর্থোপার্জ্জন করতে—জেলে আবদ্ধ রেখে আমার সে পথ বন্ধ করে দিয়েছ। এখন জেল হতে মুক্তিলাভ করতে পারলেই বাঁচি। এমতাবস্থায় বিদেশে এতগুলি লোকের সম্মুখে চেহারা দৃষ্টে অপরের বয়স বলা, যে বিদ্যা, আমি জ্ঞাত নহি—সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়ে আমাকে বিব্রত করছ কেন?" এই প্রকার চিন্তার পরেই তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া গার্ডের বয়স বলিয়া দিলেন; তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য হইয়াছিল। এই ঘটনায় সোমেশের সেখানে একটু প্রতিপত্তি ও নাম হইল।

[৪]

শিবরূপী ভোলানন্দ

ভোলানন্দের রূপ-ধ্যানে মগ্ন সাধক দেখিলেন, ভোলানন্দের স্থানে দিব্য শিবমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। আনন্দের আতিশয্যে তিনি ভোলানন্দ-প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ ও রূপধ্যানে অধিকতর মগ্ন হইলেন। রাত্রি কোথা দিয়া যাইতেছে, সে-দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি নাই।

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সাধক * হরিদ্বারে ভোলানন্দ হইতে দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক অধিকতর সাধনে মগ্ন হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় হৃষীকেশ স্বর্গাশ্রমে প্রায় পাঁচ মাস অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু সেখানেও বিশেষ কোন উন্নতি লাভ করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। স্বর্গাশ্রমস্থিত কতিপয় বাঙালী সাধু সাধককে হরিদ্বারে ভোলানন্দের নিকট অবস্থান করিবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বিবৃত করিলেন। গুরুতত্ত্বের একটু আভাস প্রাপ্ত হইয়া সাধক ভোলানন্দের নিকট অবস্থান করিবার মানসে পুনরায় হরিদ্বারে উপনীত হইলেন।

---

* এ ব্যক্তি লেখকের বিশেষ পরিচিত, কিন্তু তিনি নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং তাঁহাকে সাধক নামে অভিহিত করিলাম।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

এই শ্লোকটির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবার মানসে সাধক ভোলানন্দকে কখনও নারায়ণ, কখনও বা শিবভাবে দর্শন করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া এবং কোন্ মূর্ত্তির ধ্যান করা কর্ত্তব্য তাহা সম্যক্ বুঝিতে অক্ষম হইয়া তিনি ভোলানন্দের শরণাগত হইলেন। সাধক দ্বারা পৃষ্ট হইয়া ভোলানন্দ বলিলেন—"গুরুমূর্ত্তির ধ্যান কর।" গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক সাধক সে রাত্রে ভোলানন্দের রূপ ধ্যান ও ভোলানন্দ-প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। শিবরূপী ভোলানন্দের ধ্যানে মগ্ন সাধকের হৃদয়ে সে রাত্রে আনন্দের ধারা প্রবাহিতা হইল। রাত্রি তখন দুইটা বাজিয়াছে, তবুও সাধকের সেদিকে দৃষ্টি নাই; সে তন্দ্রা, নিদ্রা, আলস্য, জড়তা যেন মুহূর্ত্তে কোথায় অন্তর্হিত হইল—অনির্ব্বচনীয় আনন্দে সাধক বিভোর হইয়া রহিলেন। পরদিন প্রত্যূষে ভোলানন্দকে দর্শন করিতেই সাধকের হৃদয়ে দ্বিগুণ আনন্দধারা বহিতে লাগিল। তখনও ভোলানন্দকে তিনি শিবভাবেই দেখিতে পাইলেন। ভোলানন্দ সাধককে ডাকিলেন,—"......এই নে চারটি পয়সা, ঐ গরীবকে দিয়ে আয়।" সাধক ভোলানন্দকে দর্শন ও তাঁহার বাক্য পালন করিতে পারিয়া নিজেকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিতে

লাগিলেন। কিন্তু হায় বৈষ্ণবী মায়া! তারপর ধীরে ধীরে সাধকের সে ভাব নষ্ট হইতে লাগিল—গুরুকে একদিনের জন্যও তিনি আর সে-ভাবে দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ভবিতব্য ভগবানের হাতে।

[৫]

বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তিতে ভোলানন্দ

ভোলানন্দের রূপ-ধ্যানে মগ্ন শ্রীমতী——দেখিতে পাইলেন, ভোলানন্দের স্থানে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি খেলা করিতেছেন।

জিলা সিলেট, হবিগঞ্জ-নিবাসিনী শ্রীমতী——১৩৩৩ সালের হরিদ্বার কুম্ভ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নূতন উদ্যমে সাধন-ভজনে ব্যাপৃতা হইলেন। তিনি গুরুদেব ভোলানন্দকেই ইষ্টবোধে ধ্যান করিতে লাগিলেন। জপে বসিতেই মন স্থির হওয়ার পর বিভিন্নভাবের মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। একদিন দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে গেরুয়া-পরিহিত একজন দিব্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। অপর দিন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বামপার্শ্বে ব্রহ্মচারিবেশে কেহ ধ্যাননিমীলিত নেত্রে বসিয়া আছেন। একদিন দেখিলেন, সম্মুখে একজন স্ত্রীলোক (দেবী) দাঁড়াইয়া আছেন। অপর দিন দেখিলেন, দুইটি শিশু সাক্ষাতে বসিয়া খেলা

করিতেছেন। একদিন দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ দোলায় ঝুলিতেছেন ও বাঁশী বাজাইতেছেন। অপর দিন দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নাভি হইতে একটি পদ্মফুল বাহির হইয়াছে। একদিন কতকগুলি সর্পকে ফণাবিস্তার পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। অন্যদিন মৃত মনুষ্যের ন্যায় একটি বিকট মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। দুই দিন তাঁহার নিজের আকৃতিকেই সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। অন্য দিন দেখিলেন, গোপালবেশে শ্রীকৃষ্ণ হামাগুড়ি দিতেছেন। একদিন স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে যখন 'কর্পূরগৌরং' এই শব্দটি আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন মনে হইল 'ভোলানন্দ কি কর্পূর-গৌরং'—ইহা মনে হইতেই তাঁহার দেহ-মন সমস্ত ভুল হইয়া গেল এবং কপালে ঠিক ভ্রূদ্বয়ের মাঝে কর্পূরের মত বর্ণ এক মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল—শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি কোন মূর্ত্তির সহিতই তাঁহার সামঞ্জস্য নাই। এ সকল দেখিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হরিদ্বারে ভোলানন্দকে পত্র দিলেন ঃ—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু !··· ··· ··· ···

বাবা ! এসব দেখে আমার মনে হয়, তুমিই সর্ব্বজীবে আছ, তুমিই আমার দেহে আছ। তুমিই ত পরব্রহ্মস্বরূপ আত্মা, আত্মা ত সর্ব্ব জীবেই অবস্থিত, তাহা আমাকে বুঝাইবার জন্যই নানা ভাবে দেখা দিতেছ। তুমি যে শুধু তোমার দেহমূর্ত্তিতে বিরাজমান,

এটি আমার ভুল ধারণা। বাবা, এই সব কি, আমাকে বুঝাইয়া দাও। বাবা! মন স্থির হলে মাঝে মাঝে নানা প্রকার শ্লোক শুনিতে পাই, আমি বুঝিও না, মনেও রাখিতে পারি না। কোন কোন দিন নিদ্রিতাবস্থায় গুরুগীতা পাঠ করিতে থাকি, গান করি—আবার আঁমার কর্ণেই সে সব বেশ শুনিতে পাই; এই সব কি ভ্রান্তি? বাবা! তোমার পূজায় বসিলে কাঁদিতেই ভাল লাগে, পূজা কি করিব, পূজা ত জানি না—কার পূজা করিব? তুমি ত অন্তরের ধন, অন্তরেই রয়েছ, অন্তরের ধনকে কি দিয়ে পূজিব? পত্র পুষ্প দ্বারা তোমার পূজা করা বিড়ম্বনা মাত্র। বাবা! কবে প্রাণ ভরিয়া অন্তরের সহিত তোমার পূজা করিতে পারিব, কবে এই দেহ-মন তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করিতে পারিব? বাবা! মিথ্যা মায়ায় আর ভুলাইয়া রাখিও না।

ভোলানন্দ চিঠির উত্তরে লিখিলেন ঃ—

কল্যাণীয়া পুত্রী!

তোমরা আমার নারায়ণ আশীর্ব্বাদ জানিবে। যাহা কিছু শুনিতেছ, সব সত্য, যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলই তোমার ইষ্টদেব—পরমেশ্বর।

শ্রীশ্রীভোলানন্দ-প্রসঙ্গ সমাপ্ত।